মাযহাব ও তাকলীদ

একটি সহজ-সরল উপস্থাপন

মাওলানা ইমদাদুল হক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَبَعْدُ!

মানুষের অনেক বিষয় আছে সহজাত, স্বভাবজাত। স্বভাবজাতভাবেই মানুষ তা বুঝতে পারে, অনুধাবন করতে পারে। তা বোঝানোর জন্য কুরআন হাদীস কিংবা অন্য কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। যেমন ক্ষুধায় আহার করা, পিপাসায় পান করা, অসুস্থতায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। ক্ষুধা লাগলে আহার করতে হয় কেন? পিপাসায় পান করতে হয় কেন? অসুখে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় কেন? এসব বোঝানোর জন্য ভিন্ন দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। এগুলো মানুষের স্বভাবজাত। স্বভাব দিয়েই মানুষ বুঝে। বরং এগুলোতে কেউ দলিল-প্রমাণ তালাশ করলে মানুষ তাকে নিয়ে হাসবে।

আবার কিছু বিষয় আছে স্বভাবজাত নয়। স্বভাব দিয়ে বোঝা যায় না, বরং এর জন্য ভিন্ন দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন। যেমন, নামাযে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতেহা পড়বে কি না? নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া অন্য সময় হাত ওঠাবে কি না? ইত্যাদি। এগুলো স্বভাব দিয়ে বোঝার উপায় নেই। এগুলো কুরআন হাদীসের দলিল-প্রমাণ দিয়ে বুঝতে হয়। মাযহাব মানা, তাকলীদ করা, মাযহাব ও তাকলীদের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিষয়ও স্বভাবজাত বিষয়, দলিল-প্রমাণের বিষয় নয়। মানুষ অসুখে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। এটা স্বভাবজাত, ঠিক একই স্বভাবে মানুষ দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়। এটাও স্বভাবজাত।

কেউ কেউ মনে করে মাযহাব মানা বা তাকলীদ করা মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পড়া বা রাফয়ে ইয়াদাইন-এর মতো কুরআন হাদীসের দলিলনির্ভর বিষয়। কুরআন হাদীসের দলিল-প্রমাণ ছাড়া বিষয়টি বুঝে আসে না। তাই প্রথমে দলিল-প্রমাণ তালাশে ব্যস্ত হয়ে যায়। বিষয়টি এমন নয়। এজন্যই তো দেখা যায়, যারা মাযহাব মানে না বা তাকলীদ করে না দাবি করে, তাদের জনসাধারণও তাদের আলেমদের শরণাপন্ন হয়। বরং এ ছাড়া উপায়ও নেই। অবশ্য কুরআন হাদীসে মাযহাব ও তাকলীদের অসংখ্য দলিল আছে। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাতে এ বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এ বিষয়ের সংশয় নিরসনে পুস্তিকাটি কিছুটা হলেও সহায়ক হবে ইনশা-আল্লাহ।

আমার পরম সৌভাগ্য, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর সম্মানিত আমীনুত তালীম, মুসলিম বিশ্বের অন্যতম মুহাক্কিক ফকীহ ও হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বইটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। এই মহান ব্যক্তির সময় পাওয়া এবং তাঁর থেকে সময় নেওয়ার আমি মোটেও উপযুক্ত নই। তাঁর সান্নিধ্যে আমার কিছুদিন ছাত্র হিসেবে থাকার পরম সৌভাগ্যও হয়েছে, কিন্তু আমি তাঁর ছাত্র হতে পারিনি। তারপরও তিনি অধমকে সময় দিয়েছেন। এটা অধমের অন্যতম বড় প্রাপ্তি।

পাশাপাশি তিনি অধমের প্রতি সহানুভূতি করে একটি ভুমিকা লিখে দিয়েছেন এবং তিনি পুস্তিকার নামও চয়ন করে দিয়েছেন। আমি বাকরুদ্ধ, কীভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করব এবং হুজুরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব! আল্লাহ তাআলা হুজুরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

হুজুরের কাছে একটি লেখা মানোত্তীর্ণ হওয়ার যে উচ্চমানদ-, জানি না আমার পুস্তিকাটি সেই মানে উঠতে পেরেছে কি না। তবে হুজুরের দেখে দেওয়ার পর পাঠককে এতটুকু বলতে পারি, এতে মারাত্মক কোনো ভুল নেই ইনশা-আল্লাহ।

হুজুরের কাছে একটি লেখা মানোত্তীর্ণ হওয়ার যে উচ্চমানদ-, জানি না আমার পুস্তিকাটি সেই মানে উঠতে পেরেছে কি না। তবে হুজুরের দেখে দেওয়ার পর পাঠককে এতটুকু বলতে পারি, এতে মারাত্মক কোনো ভুল নেই ইনশা-আল্লাহ।

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর সম্মানিত উস্তাদ 'এসব হাদীস নয়-১'-এর রচয়িতা হযরত মাওলানা মুতীউর রহমান ছাহেবও বইটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়ে এর ভাষাগত ত্রুটি যথাসম্ভব সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনি আমার বড় মুহসিন মুরব্বী ও মুখলিস উস্তাদ। তাঁর প্রতিও অন্তরের গভীর থেকে অসংখ্য শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলা উভয় উস্তাদকে তাঁর শান অনুযায়ী প্রতিদান দান করুন, আমীন।

পুস্তিকাটিতে যে কয়টি শিরোনামের ওপর যতসামান্য আলোচনা করা হয়েছে তার প্রায় সবকটিই পরস্পরে সূত্রবদ্ধ। তাই পাঠকের প্রতি পুরো পুস্তিকাটি পড়ার অনুরোধ রইল। নতুবা বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ কাঠামো সামনে নাও আসতে পারে, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠকের ভুল বোঝাবুঝিরও আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

পাশাপাশি পুস্তিকাটি পড়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন, সংশয়, অস্পষ্টতা বা পরামর্শ থেকে থাকে, তাহলে তা লেখককে জানানোর অনুরোধ রইল। আল্লাহ তাআলা এর উত্তম প্রতিদান দেবেন।
পরিশেষে দুআপ্রার্থী, আল্লাহ তাআলা যেন পুস্তিকাটি কবুল করেন, সিহহাত ও আফিয়াতের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ দ্বীনী হায়াত দান করেন।

দুআপ্রার্থী
ইমদাদুল হক
২৭ রমযান, ১৪৪১ হিজরী
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ!

তাকলীদ ও মাযহাব অনুসরণের হাকীকত বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা যায়। একটি আঙ্গিক উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর রচিত 'তাকলীদ কী শরয়ী হাইসিয়্যাত'-এ অবলম্বন করেছেন। এ কিতাবের আলোকেই হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া নুমানী মুদ্দাযিল্লুহুল আলী তাঁর 'তাকলীদ আওর মাসলাকী ইখতিলাফ কী হাকীকত'-তে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছেন।

তাকলীদের হাকীকত ও তার শরয়ী অবস্থান জানার জন্য সবচেয়ে জরুরি কাজ হল ফতোয়ার (ইস্তিফতা ও ইফতার) পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাস জানা। এমনিভাবে মাযহাব অনুসরণের হাকীকত ও তার শরয়ী অবস্থান জানার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ফিকহী মাযহাবগুলোর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাস জানা। এই আঙ্গিকে যদি এ দুটি বিষয় জানা হয় তাহলে খুব সহজেই এগুলোর হাকীকত ও স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে এবং এগুলোর অবস্থান সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে যাবে।

ফতোয়ার ইতিহাস সবিস্তারে একত্রে বয়ান করেছেন ইবনে হাযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৪৫৬হি.)। বিক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ের তথ্যাদি প্রথম যুগের ইমামগণের বরাতে 'তবাকাতে ইবনে সা'দ'সহ ইতিহাস ও তারাজীমের প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে হাযম রহ.-এর আলোচনা সামনে রেখে এ বিষয়ে সুন্দর একটি খোলাসা পেশ করেছেন ইবনুল কায়্যিম রহ. 'ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন'-এর শুরুতে। আমাদের উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা আমীন সফদর রহ.

তাকলীদের মাসআলা প্রায়ই এই ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করতেন। এক্ষেত্রে তিনি গাযালী রহ.-এর 'আল্মুস্তাসফা' এবং আমেদী রহ.-এর 'ইহ্কামুল আহকাম'-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতিও টানতেন। ইমাম গাযালী রহ. বলেন-

اَلْعَامِّيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْاسْتِفْتَاءُ وَاتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ،... بِمَسْلَكَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوْا يُفْتُوْنَ الْعَوَامَّ، وَلَا يَأْمُرُوْنَهُمْ بِنَيْلِ دَرَجَةِ الْاِجْتِهَادِ، وَذٰلِكَ مَعْلُوْمٌ عَلَى الضَّرُوْرَةِ وَالتَّوَاتُرِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَعَوَامِّهِمْ...

আলমুস্তাসফা মিন ইলমিল উসূল, ইমাম আবু হামেদ আলগাযালী রহ. (৫০৫হি.) ২/৩৮৯, আলমাতবাআতুল আমীরিয়্যাহ, বুলাক মিসর, ১৪১৪ হি.

আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদী রহ. বলেন-

اَلْعَامِّيُّ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْاِجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ مُحَصِّلًا لِبَعْضِ الْعُلُوْمِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْاِجْتِهَادِ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْأَخْذُ بِفَتْوَاهُمْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ الْأُصُوْلِيِّيْنَ...، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُوْلُ...

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ أَنَّهُ لَمْ تَزَلِ الْعَامَّةُ فِيْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ قَبْلَ حُدُوْثِ الْمُخَالِفِيْنَ يَسْتَفْتُوْنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَيَتَّبِعُوْنَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ يُبَادِرُوْنَ إِلٰى إِجَابَةِ سُؤَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ إِلٰى ذِكْرِ الدَّلِيْلِ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ، فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلٰى جَوَازِ اتِّبَاعِ الْعَامِّيِّ لِلْمُجْتَهِدِ مُطْلَقًا.

আলইহকাম ফী উসূলিল আহকাম, ইমাম সাইফুদ্দীন আমেদী রহ. (৬৩১ হি.) ৪/৪৫১

এমনিভাবে মাযহাব অনুসরণের ইতিহাসের ওপর আলোচনা প্রথম যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.। আলী ইবনুল মাদীনী রহ. হলেন ইমাম বুখারী ও তাঁর সমসাময়িক হাদীসের ইমামগণের খাস উস্তায।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (জন্ম ১৬১ হি., মৃত্যু ২৩৪ হি.)-এর এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেসব প্রাচীন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো ছেপেছে অনেক পরে। যেমন আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর 'আলইলাল' (সংশ্লিষ্ট অংশ), ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আলফাসাবী রহ.-এর 'আলমারিফাতু ওয়াত-তারীখ', বাইহাকী রহ.-এর 'আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা'। এ কারণে ইজতেহাদ, তাকলীদ ও ফিকহের ইতিহাসের ওপর যারা লিখেছেন সাধারণত এই বরাত তাদের উল্লেখের বাইরে থেকে যায়। ফাতহুল মুগীস (৪/১০৬, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, প্রথম প্রকাশনা ১৪১৫হি.)-এ খুব সংক্ষেপে এদিকে এভাবে ইশারা করা হয়েছে

(وَهُوَ) أَيْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، (وَزَيْدٌ) هُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، (وَابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ (فِي الْفِقْهِ أَتْبَاعٌ) وَأَصْحَابٌ (يَرَوْنَ) فِيْ عَمَلِهِمْ وَفُتْيَاهُمْ (قَوْلَهُمْ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ حَاصِرًا لِذٰلِكَ فِيْهِمْ، وَعِبَارَتُه: اِنْتَهٰى عِلْمُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَحْكَامِ إِلٰى ثَلَاثَةٍ مِمَّنْ أُخِذَ عَنْهُمُ الْعِلْمُ، وَذَكَرَهُمْ. فَهُمْ كَالْمُقَلَّدِيْنَ، وَأَتْبَاعُهُمْ كَالْمُقَلِّدِيْنَ لَهُمْ.

এবং এই সংক্ষিপ্ত ইবারতকেই হয়ত মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আলহাজাবী রহ. (১৩৭৬ হি.) 'আলফিক্রুস সামী'তে এভাবে উল্লেখ করেছেন

قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَةِ الْعِرَاقِيِّ، نَقْلًا عَنِ ابْنِ الْمَدِيْنِيِّ أَنَّ الْمَذَاهِبَ الْمُقَلَّدَةَ أَرْبَابُهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ثَلَاثَةٌ: عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَتْبَاعٌ فِي الْفِقْهِ يُدَوِّنُ عِلْمَهُمْ وَفَتْوَاهُمْ وَقَوْلَهُمْ.

বলা ভালো, এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে এটা আঁচ করাও সম্ভব না যে, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর মূল আলোচনাটা আসলে কেমন।

আল্লামা কাউসারী রহ. (১৩৭১ হি.) 'ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া-হাদীসুহুম'-এ ফিকহে ইসলামীর ইতিহাস এই আঙ্গিকেই তুলে ধরেছেন। যদিও তিনি ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেননি।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে কতক সালাফী আলেমের সঙ্গে মুযাকারা করতে গিয়ে দেখা গেল তাকলীদ ও মাযহাবের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। খুব সম্ভব এ কারণেই তারা মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধিতায় চরম প্রান্তিকতার শিকার। সে সময় মাসিক 'আলকাউসার'-এর মহররম ১৪২৮ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ২০০৭ঈ. সংখ্যায় 'সালাফের বক্তব্যে মাযহাব ও তাকলীদ শব্দের ব্যবহার' শিরোনামে নিবন্ধ লিখেছিলাম, তাতে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর আলোচনার কিছু নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। নিবন্ধটি বেশ সংক্ষিপ্ত ছিল, তাই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ পর্যন্তই সীমিত রাখা হয়।

মাযহাবের ইতিহাসের আলোকে যারা মাযহাবের হাকীকত আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অষ্টম শতাব্দীর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.। 'মিনহাযুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ'-এ শিয়াদের বিভিন্ন অমূলক আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে তিনি মাযহাবের ইতিহাস সম্পর্কে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। ওই আলোচনা যাদের পড়া হয়েছে তারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন যে, মাযহাবের বিরুদ্ধে গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের যে প্রোপাগান্ডা তা মূলত শিয়াদের কাছ থেকে ধার করা। হযরত মাওলানা সরফরায খান সফদর রহ. (জন্ম ১৩৩৩ হি. মৃত্যু ১৪৩০হি.) 'আলকালামুল মুফীদ ফিল ইজতিহাদি ওয়াত-তাকলীদ'-এ ওই আলোচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আমাদের উস্তায হযরত মাওলানা আমীন সফদর রহ.ও (১৩৫২হি.-১৪২১হি.) ওই আলোচনার আলোকে গাইরে মুকাল্লিদদের বিভিন্ন অমূলক আপত্তির জবাব দিতেন।

আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুন আমাদের শাগরেদ মাওলানা ইমদাদুল হককে, তিনি বক্ষ্যমাণ কিতাবে তাকলীদ ও মাযহাব সম্পর্কে এই ফিতরী উসলুবে (সহজাত শৈলীতে) আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সালাফের বিভিন্ন বক্তব্যের পাশাপাশি ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর পুরো বক্তব্য বরাতসহ উল্লেখ করেছেন।

তিনি এই কিতাবে বিভিন্ন প্রাচীন উৎসগ্রন্থের বরাতে ফতোয়া ও মাযহাবের ইতিহাস এমন সুন্দর শৈলীতে উপস্থাপন করেছেন যে, আলোচনার আঙ্গিক থেকেই তাকলীদ ও মাযহাবের হাকীকত এবং এই দুইয়ের শরয়ী অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং এই বিষয়টিও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাকলীদ ও মাযহাবের অনুসরণ খাইরুল কুরূন থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসা একটি স্বীকৃত কর্মধারা। একে বেদআত বলা উসূলে ফিকহ, উসূলে শরীয়ত এবং ফিকহ ও শরীয়তের ইতিহাসের ব্যাপারে অজ্ঞতা।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর আলোচনাটি (যা এই কিতাবের পৃ. ৩৮ থেকে পৃ. ৪২ পর্যন্ত) বুঝে পড়া হলে 'আলেমগণের জন্য মাযহাবের অনুসরণ কীভাবে বৈধ হতে পারে!'—কিছু লোকের এই অমূলক আপত্তির জবাবও পাওয়া যাবে। পাঠক দেখতে পাবেন তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের যামানার মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ কীভাবে নিজ নিজ যামানার ইমামগণের মাযহাবের অনুসরণ করেছেন।

মূলত ফিক্হ ও হাদীসের পারস্পরিক যে সুগভীর সম্পর্কএ বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই তাকলীদ ও মাযহাবের বিরুদ্ধবাদীদের। তারা যদি বাস্তব বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করত, তাহলে জানত যে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন ও সুন্নাহয় যে শরীয়ত দান করেছেন, যে বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا (الجاثية ১৮)

ফিকহী মাযহাবগুলো আসলে এই শরীয়তেরই বিশ্লেষিত (মাশরূহ), (মারবী) ও সংকলিত (মুদাওয়ান) রূপ। তলাবায়ে কেরাম এই বিষয়টি বোঝার জন্য শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহর 'আসারুল হাদীসিশ শারীফ ফিখ্তিলাফিল আইম্মাতিল ফুকাহা' ও তাঁর অপর কিতাব 'আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ-দ্বীন' অধ্যয়ন করতে পারেন।

তাকলীদ ও মাযহাবের সঠিক ইতিহাস জানার দ্বারা বহু ভুল ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝি এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। যেমন

১. এই ভুল ধারণা যে, 'হাদীস প্রথম থেকেই আছে আর ফিকহ হল নব আবিষ্কৃত!' অথচ যেদিন থেকে হাদীস আছে সেদিন থেকেই ফিকহ আছে। ফিকহ ছাড়া হাদীসের ওপর আমল কীভাবে সম্ভব!?

২. এই গলদ ধারণা যে, 'হাদীসের সংকলন হয়েছে প্রথমে আর ফিকহের সংকলন হয়েছে পরে!' অথচ যখন থেকে হাদীসের সংকলন শুরু হয়েছে তখন থেকেই ফিকহের সংকলনও হয়েছে। হাদীসের সঙ্গে ফিকহ সংকলন না করে কেবল হাদীস সংকলনের যে ধারা আমরা দেখতে পাই তা যামানার প্রয়োজনে অনেক পরে তৃতীয় শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে। নতুবা এর আগে হাদীস ও ফিকহ একত্রেই সংকলিত হত।

৩. এই গলদ ধারণা যে, 'আইম্মায়ে মুজতাহিদীন হচ্ছেন পরের আর মুহাদ্দিসগণ হলেন আগের!' অথচ সালাফের যুগে প্রত্যেক ফকীহ মুহাদ্দিস ছিলেন। মাযহাবের চার ইমামের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) ছিলেন ইমাম বুখারী রহ. (২৫৬ হি.)-এর উস্তায। ইমাম বুখারী রহ. মাত্র এক ওয়াছিতায় (মাধ্যমে) ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম বুখারী রহ. ফিকহের ইস্তেফাদা করেছেন ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শাগরেদ ইমাম হুমায়দী রহ. থেকে। ইমাম বুখারী রহ. ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ এবং ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন। ইমাম বুখারী রহ.-এর এই দুই দাদা উস্তায ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন।

ইতিহাস সম্পর্কে যাদের জানাশোনা আছে তারা জানেন, হাদীসের প্রত্যেক বড় ইমাম কোনো না কোনো ফিকহী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হাদীসকে ফিকহের মোকাবেলায় পেশ করার এই বেদআত গত এক-দেড়শ বছর থেকে শুরু হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে এই ফেতনা থেকে এবং ছোট-বড় অন্য সকল ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আযীযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হককে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যিনি এই ফেতনাকে সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা করেছেন।

মুহাদ্দিসগণ হলেন আগের!' অথচ সালাফের যুগে প্রত্যেক ফকীহ মুহাদ্দিস ছিলেন। মাযহাবের চার ইমামের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) ছিলেন ইমাম বুখারী রহ. (২৫৬ হি.)-এর উস্তায। ইমাম বুখারী রহ. মাত্র এক ওয়াছিতায় (মাধ্যমে) ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম বুখারী রহ. ফিকহের ইস্তেফাদা করেছেন ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শাগরেদ ইমাম হুমায়দী রহ. থেকে। ইমাম বুখারী রহ. ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ এবং ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন। ইমাম বুখারী রহ.-এর এই দুই দাদা উস্তায ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন।

ইতিহাস সম্পর্কে যাদের জানাশোনা আছে তারা জানেন, হাদীসের প্রত্যেক বড় ইমাম কোনো না কোনো ফিকহী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হাদীসকে ফিকহের মোকাবেলায় পেশ করার এই বেদআত গত এক-দেড়শ বছর থেকে শুরু হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে এই ফেতনা থেকে এবং ছোট-বড় অন্য সকল ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আযীযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হককে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যিনি এই ফেতনাকে সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা করেছেন।

أَثَابَهُ اللهُ تَعَالَى حُسْنَى وَزِيَادَةً، وَكَتَبَ لَهُ السِّتْرَ وَالسَّلَامَةَ وَالْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدَّارَيْنِ، وَحَفِظَهُ فِي نَفْسِهِ، وَأَصْلَحَ لَهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَطُلَّابِهِ وَمُحِبِّيهِ، وَأَدْخَلَهُ فِي عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، آمِينَ.

আরযগুযার
বান্দা **মুহাম্মাদ আবদুল মালেক** গুফিরা লাহু
৩রা শাওয়াল ১৪৪০ হি.
জুমাবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'তাকলীদ কী ও কেন', 'মাযহাব কী ও কেন'এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় অনেককে দেখা যায়, তারা মানুষকে বিভিন্ন অহেতুক প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত করে থাকে। অথচ তাকলীদ ও মাযহাব ইসলামের শুরু যামানা থেকেই আছে। দ্বীন ও শরীয়তের যে বিষয় যার জানা দরকার তার কর্তব্য হল আলেমের কাছ থেকে তা জেনে নেওয়া। আলেম তার জিজ্ঞাসার জবাবে যে ফতোয়া দেবেন ওই ফতোয়ার অনুসরণের নামই হল তাকলীদ। আলেমের ফতোয়ার ভিত্তি কুরআন সুন্নাহ এবং কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত শরীয়তের অন্যান্য দলিল।

মুজতাহিদ আলেমগণ (ইমামগণ)-এর ফতোয়া এবং কুরআন সুন্নাহ ও শরীয়তের অন্যান্য দলিল থেকে তাঁদের লব্ধ বিধিবিধানের সমষ্টির নাম হল মাযহাব। মুফতী আলেম ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী ফিকহের এই ভা-ার থেকে সাহায্য নিয়ে থাকেন। এরই নাম মাযহাব অনুসরণ। তাকলীদের যে মর্ম ওপরে বলা হল এর নজির নবী-যুগ থেকেই বিদ্যমান। তেমনি মাযহাব অনুসরণের বিষয়টিও সাহাবী-যুগেই শুরু হয়ে গেছে।

বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার, ফিক্হ-ফতোয়া ও মাযহাব (ফিকহী মাযহাব)-এর পূর্ণ ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানা দরকার। সেটাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে ছিলেন সেখানকার লোকজন আল্লাহ তাআলার বিধান জানার জন্য, মাসআলা-মাসায়েলের সমাধানের জন্য তাঁরই শরণাপন্ন হত। তিনি মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান করে দিতেন এবং আল্লাহ তাআলার বিধান বলে দিতেন। নবীজী যেখানে ছিলেন না সেখানে তিনি তাঁর কোনো ফকীহ সাহাবীকে প্রেরণ করতেন। সেখানকার লোকজন নবীজীর এসব প্রতিনিধির শরণাপন্ন হত এবং তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহর বিধান জানত এবং যথাযথভাবে আমল করত।

নবুওয়তের প্রাথমিক যুগ। নবীজী তখনো মক্কায়। মদীনার বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের দাওয়াতের ফলে মদীনায় ইসলাম আরো প্রচার-প্রসার লাভ করে। তখন সেখানকার মুসলমানদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য এবং তাদের মাসআলা-মাসায়েলের সমাধানের জন্য লোক প্রেরণের প্রয়োজন পড়ে। এ অবস্থায় নবীজী তাঁর সাহাবীদের থেকে হযরত মুসআব বিন উমায়ের রা.কে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে মদীনায় প্রেরণ করেন।

হযরত মুসআব রা.কে মদীনায় প্রেরণের আগে মদীনাবাসী নবীজীকে লেখেন-

إِنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ فَشَا فِينَا، فَابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيُفَقِّهُنَا الْإِسْلَامَ، وَيُقِيمُنَا لِسُنَّتِهِ وَشَرِيعَتِهِ، وَيَؤُمُّنَا فِي صَلَاتِنَا.

‘আমাদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে। অনেক মানুষ মুসলমান হয়েছে। তাই আপনি আপনার কোনো এক সঙ্গীকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন, যে আমাদেরকে কুরআন শেখাবে ও বোঝাবে, আমাদেরকে শরীয়ত ও সুন্নাহর তরবিয়ত করবে এবং আমাদের নামাযে ইমামতি করবে।’

فَبَعَثَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَكَانَ يَنْزِلُ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ. وَكَانَ مُصْعَبُ يُسَمَّى بِالْمَدِينَةِ بِالْمُقْرِئِ. وَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى دُورِ الْأَنْصَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيُفَقِّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ.

'তখন নবীজী মুসআব বিন উমায়ের রা.কে প্রেরণ করেন। তিনি কারী সাহাবী ছিলেন এবং তিনি আবু উমামা রা.-এর ঘরে অবস্থান গ্রহণ করেন। আবু উমামা রা.। তাঁকে মদীনার লোকদের কাছে নিয়ে যেতেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে দ্বীন শেখাতেন।' দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ, ইমাম বাইহাকী ২/৪৩৭

ইয়ামানবাসী যখন মুসলমান হল নবীজী তাদেরকে দ্বীন শেখানোর এবং তাদের মাঝে আমীর নিযুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ইয়ামানের উঁচু-নিচু দুটি অঞ্চল বা অংশ ছিল। উঁচু অঞ্চলের জন্য নবীজী হযরত মুআয বিন জাবাল রা.কে নির্বাচন করেন। নিচু অঞ্চলের জন্য নির্বাচন করেন হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে। এই দুজন নিজ নিজ অঞ্চলের যেমন প্রশাসনিক কাজকর্ম আঞ্জাম দিতেন, তেমনিভাবে অঞ্চলদুটির মুসলমানদের দ্বীন শেখানো এবং দ্বীনী জিজ্ঞাসাবলির সমাধানের দায়িত্বও আঞ্জাম দিতেন। প্রেরণের মুহূর্তে নবীজী উভয়কে উপদেশ দেন, 'তোমরা মানুষকে সুসংবাদের মাধ্যমে কাছে টেনে নেবে, ভয়-ভীতির মাধ্যমে তাদের দূরে ঠেলে দেবে না। সবক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করবে, কঠোরতা করবে না।'

এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন ফকীহ সাহাবীকে বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে পাঠান। তাঁরা সেখানে মুসলমানদেরকে যেমন দ্বীন শেখাতেন, তেমনিভাবে তাদের দ্বীনী জিজ্ঞাসারও সমাধান দিতেন। বরং খোদ মদীনাতেও নবীজীর বর্তমানে তাঁর নির্দেশে ও নির্বাচনে একাধিক সাহাবী ফতোয়া দিতেন বা মুসলমানদের দ্বীনী জিজ্ঞাসার সমাধান দিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়

مَنْ كَانَ يُفْتِيْ زَمَنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، مَا أَعْلَمُ غَيْرَهُمَا.

'নবীজীর যুগে মানুষকে কে কে ফতোয়া দিত? জবাবে তিনি বলেন, আবু বকর রা. ও উমর রা.। এ ছাড়া আমি আর কারো ব্যাপারে জানি না।' তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/৩

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রহ. বলেন-

كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ يُفْتُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'হযরত আবু বকর রা., উমর রা., উসমান রা., আলী রা. প্রমুখ নবীজীর যুগে ফতোয়া প্রদান করতেন।' প্রাগুক্ত

ইতিহাসবিদ ইবনে সা'দ রহ. এ প্রসঙ্গে শিরোনাম দিতে গিয়ে লেখেন-

ذِكْرُ مَنْ كَانَ يُفْتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ وَيُقْتَدٰى بِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ.

'নবীজীর যুগে ও পরে যেসব সাহাবী মদীনায় ফতোয়া প্রদান করতেন এবং (মানুষ) যাদের অনুসরণ করত তাঁদের আলোচনা।' প্রাগুক্ত

সাহাবায়ে কেরামের সবাই ফতোয়া প্রদান করতেন না। কারণ, ফতোয়া প্রদান করার জন্য অনেক ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন। তাই অল্প কিছু সাহাবীই ফতোয়া প্রদান করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেশি ফতোয়া প্রদান করতেন, তাঁরা হলেন সাতজন হযরত উমর রা., হযরত আলী রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হযরত আয়েশা রা., হযরত যায়েদ বিন ছাবেত রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মদীনাবাসীর বেশির ভাগ জিজ্ঞাসার সমাধান দিতেন হযরত যায়েদ বিন ছাবেত রা.। তাঁর ইন্তেকালের পর ফতোয়া প্রদানের কাজ আঞ্জাম দেন তাঁর প্রাজ্ঞ শিষ্যগণ। তাদের মধ্যে তাঁর পুত্র খারিজা ইবনে যায়েদ রহ.; কাবীসা ইবনে যুআইব রহ., সুলাইমান বিন ইয়াসার রহ. ও আফফান বিন উসমান রহ. সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাদের পর মদীনাবাসীর ফতোয়া প্রদানের কাজ আঞ্জাম দেন তাদের প্রাজ্ঞ ছাত্রগণ, যাদের মাঝে হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহ্রী রহ., আবুয্ যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান রহ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাদের পরে আসেন তাদেরই শিষ্য ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. (ইমাম মালেক) কাসীর ইবনে ফারকাদ রহ., আব্দুল আযীয ইবনে আবী সালামা আলমাজিশূন রহ. প্রমুখ।

নবীজীর পরে মক্কাবাসীর বেশির ভাগ মাসআলার সমাধান দিতেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। তাঁর ইন্তেকালের পর মক্কাবাসীর মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দিতেন তাঁরই শিষ্যগণ। যাদের মধ্যে সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ., জাবের ইবনে যায়েদ রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তাদের পরে আসেন পর্যায়ক্রমে আম্র ইবনে দীনার রহ., আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ রহ., সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ., যারা তাদেরই শিষ্য বা শিষ্যের শিষ্য।

সতের হিজরীতে যখন হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা.-এর নেতৃত্বে কুফা অঞ্চল বিজিত হয়, তখন খলীফা হযরত উমর রা. তা আবাদ করার নির্দেশ দেন। তখন সেখানে এমন কিছু লোক প্রেরণের প্রয়োজন পড়ে, যারা সেখানকার লোকদেরকে দ্বীন শেখাবে এবং তাদের দ্বীনী সমস্যাবলির সমাধান দেবে। এর জন্য হযরত উমর রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে নির্বাচন করেন। এ যাবৎ তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে নিজের কাছেই রেখেছেন। কোনো দিকে যেতে দেননি। দ্বীনী ও প্রশাসনিক যেকোনো ক্ষেত্রে উমর রা. তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কিন্তু যখনই কুফা নগরী আবাদের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে ওই নগরীর দ্বীনী আবাদের জন্য নির্বাচন করেন।

তখনকার ঘটনা, একবার শামবাসীকে হযরত উমর রা. কিছু বাড়তি অনুদান দেন। এতে কুফাবাসী শামবাসীর তুলনায় অনুদান কম দেওয়ার অনুযোগ করলে খলীফা উমর রা. বলেন-

يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ! أَجَزِعْتُمْ أَنْ فَضَّلْتُ أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

অর্থাৎ হে কুফাবাসী, শামবাসীকে তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়াতে তোমরা অধৈর্য হয়ে গেলে? অথচ আমি ইবনে মাসউদের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন ১/৩৩

একদিন হযরত উমর রা. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কথা স্মরণ করে বলেন, 'ইবনে মাসউদ ইলম-পূর্ণ একটি পাত্র। তাঁর ক্ষেত্রে কাদেসিয়াবাসীকে খোদ আমার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছি।' তাবাকাত ইবনে সা'দ ২/১২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যত দিন জীবিত ছিলেন তিনিই কুফাবাসীর অধিকাংশ মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দিতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন তাঁরই প্রাজ্ঞ শাগরেদগণ, যাদের মধ্যে আলকামা ইবনে কায়েস আননাখায়ী রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ., মাসরুক ইবনে আজদা' রহ., আবিদা আসসালমানী রহ. প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের ইন্তেকালের পর এই কাজ আঞ্জাম দেন তাঁদের ছাত্রগণ। যাদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী রহ. ও আমের ইবনে শারাহীল আশশা'বী রহ. উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের ইন্তেকালের পর এই কাজ আঞ্জাম দেন তাঁদেরই ছাত্র হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ., হাকাম ইবনে উতায়বা রহ., মানসুর ইবনুল মু'তামির রহ. প্রমুখ। তাদের পর ফতোয়া প্রদানের কাজ আঞ্জাম দেন তাদের শিষ্য সুফিয়ান ছাওরী রহ., আবু হানীফা নুমান ইবনে ছাবেত আলকুফী রহ. (ইমাম আবু হানীফা রহ.) প্রমুখ।

মিশর যখন বিজিত হয় তখন সেখানে ফতোয়া প্রদানের কাজ আঞ্জাম দেন সাহাবী আমর ইবনুল আস রা.। তাঁর পরবর্তী সময়ে উক্ত দায়িত্ব আঞ্জাম দেন ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব রহ., বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ আলআশাজ্জ রহ. প্রমুখ। তাঁদের পরবর্তী সময়ে আসেন আমর ইবনে হারিস রহ., লাইস ইবনে সা'দ রহ. প্রমুখ। তাঁদের পরে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ., মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশশাফেয়ী রহ. (ইমাম শাফেয়ী রহ.) প্রমুখ।

বাগদাদ নগরীর যখন গোড়াপত্তন হয় তখন সেখানে অনেক মুফতী ছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম রহ., আবু সাওর ইবরাহীম ইবনে খালেদ আলকালবী রহ.। তাঁদের পরে এই ফতোয়ার কাজ আঞ্জাম দেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (ইমাম আহমাদ রহ.)।

এভাবে শাম, ইয়ামান, বসরা প্রভৃতি ইসলামী নগরীতে গোড়াপত্ততের সূচনালগ্নেই এমন লোক প্রেরণ করা হয়, যারা মুসলমানদের উক্ত দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে প্রসিদ্ধ চার ইমামের ওপর। তাঁরা স্ব স্ব যুগে নিজেদের অঞ্চলের মানুষের দ্বীনী সমস্যাবলির সমাধান দিতে থাকেন।

সুতরাং এই যে মানুষ স্ব স্ব যুগের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ফকীহের শরণাপন্ন হয় আর ফকীহ তাদের সমস্যাবলির সমাধান দেন এবং এর পর তারা সে অনুযায়ী আমল করে, এটিই হল মাযহাব মানা। আর এসব ফকীহ যেসব সমাধান বাতলে দেন তাই হল তাদের মাযহাব ।

এই যে ধারা উল্লেখ করা হয়েছে এটি এমন এক ইতিহাস ও বাস্তবতা, যার কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ফিক্হ-ফতোয়া ও মাযহাবের ইতিহাস-সংক্রান্ত কিতাবে, সাহাবী-তাবেয়ী ও ফুকাহায়ে কেরামের জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলিতে এবং ইতিহাসের বড় বড় গ্রন্থাবলিতে এই ধারার উল্লেখ রয়েছে। এটি এমন এক বাস্তবতা, যা উপেক্ষা করা বা অস্বীকার করা সামান্য বোঝের অধিকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব নয়। তারপরও কেউ প্রয়োজন বোধ করলে এই কিতাব দুটি দেখে নিতে পারেন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. রচিত ‘ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন’, মুহাম্মাদ বিন হাসান আলহাজাভী রহ. কৃত ‘আলফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিক্হিল ইসলামী’।

তো নবীজীর পর থেকে চার ইমাম পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই প্রতিটি অঞ্চলেই এমন ফকীহ আলেম বিদ্যমান ছিলেন, যারা স্ব স্ব যুগের স্ব স্ব অঞ্চলের মানুষকে আল্লাহর বিধান জানাতেন, তাদের দ্বীনী সমস্যাবলির সমাধান দিতেন। মানুষও তাঁদের শরণাপন্ন হত, তাঁদের থেকে আল্লাহর বিধান জেনে নিত। তো এই চার ইমাম নতুন কিছু নয়, প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি অঞ্চলে যেভাবে ধারাবাহিকভাবে ফকীহ এসেছেন চার ইমামও সে ধারাবাহিকতার একটি পর্ব বা প্রান্তমাত্র। তাঁদের আগে প্রতিটি অঞ্চলে ফকীহগণের যে ধারা ছিল, সে ধারা-পরম্পরা এই চার ইমাম পর্যন্ত আসে। তাঁদের আগের মানুষও সমকালীন ফকীহদের শরণাপন্ন হত। তাঁদের যুগের মানুষও তাঁদের শরণাপন্ন হয়।

সুতরাং এই যে মানুষ স্ব স্ব যুগের প্রাজ্ঞ ফকীহের শরণাপন্ন হয়, আর ফকীহ তাদের সমস্যাবলির সমাধান বলে দেন, এরপর তারা সে অনুযায়ী আমল করেএটিই হল স্ব স্ব ফকীহের মাযহাব মানা। আর সেসব ফকীহ যেসব সমাধান বাতলে দিয়েছেন, সেগুলো হল তাদের মাযহাব। হাদীস, আছার, ফিক্হ, তারীখ, তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ের কিতাবে যে বলা হয়এটি সাহাবীর মাযহাব, সেটি অমুকের মাযহাব, এর দ্বারা এসব সমাধানকেই বোঝানো হয়। আর এসব ফকীহকেই বলা হয় ইমাম। এটি সর্বজনবিদিত এক বাস্তবতা, যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

উপরিউক্ত ইতিহাস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, মাযহাবের সূচনা বা আবিষ্কার চার ইমাম থেকেই নয়, বরং আগ থেকেই চলে এসেছে। চার ইমামের মাযহাব সেসব মাযহাবের ধারাবাহিক সূত্রের প্রান্তমাত্র।

অনেক সময় দেখা যায়, একটি বিষয়ের ধারাবাহিক সূত্র থাকে গোড়া থেকে। এরপর তা চলতে চলতে পরবর্তী অনেক দূর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঘটনাক্রমে ধারাটির পরবর্তী কোনো অংশ বা প্রান্ত যেকোনো কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তখন স্বল্প-জ্ঞানীরা ভাবে, পুরো ধারাটি সে প্রসিদ্ধ অংশ থেকেই সূচিত, আগে এ ধারার প্রবাহ বা অস্তিত্বই ছিল না। এ ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতা।

উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল কাদের জীলানী রহ. একজন প্রসিদ্ধ ওলী, যাঁর মৃত্যু ৫৬১ হিজরীতে। তিনি আল্লাহ তাআলার ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন ওলী। কোনো কারণে তাঁর যুগ থেকে অদ্যাবধি বিশ্বময় তাঁর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি হয়ে যায়। তবে এর অর্থ এই নয়, তাঁর আগে কোনো ওলীই ছিলেন না। বরং এমন মনে করা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। ওলীআল্লাহর ধারা আগে থেকেই চলমান। শায়েখ জীলানী সে ধারারই একজন। তাঁর পরেও তা অব্যাহত রয়েছে। তো শায়েখ জীলানীর আগেও তাঁর মতো ওলী ছিলেন, বরং তাঁর থেকেও আরো বড় ওলী ছিলেন। শায়েখ জীলানীও সে ধারার একটি অংশ বা পর্বমাত্র।

তেমনিভাবে ইমাম বুখারী রহ. হাদীস শাস্ত্রের একজন ইমাম। তাঁর যুগ থেকে অদ্যাবধি তিনি বিশ্বময় প্রসিদ্ধ। এর অর্থ এই নয়, হাদীস শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের ধারা তাঁর থেকেই সূচিত। তাঁর আগে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম পর্যায়ের কোনো লোক ছিলেন না। এমন মনে করা নিতান্তই ইতিহাস-অজ্ঞতা। হাদীসের পাণ্ডিত্যের ধারা তো আগ থেকেই চলে এসেছে। ইমাম বুখারী রহ. সে ধারার একটি প্রসিদ্ধ পর্ব বা অংশমাত্র।

তাঁর আগে তাঁর মতো এবং তাঁর থেকেও বড় বহু হাদীসবিদ অতিবাহিত হয়েছেন। খুলাফায়ে রাশেদীন, ইবনে মাসউদ রা., ইবনে আব্বাস রা., আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ সাহাবী; মুজাহিদ ইবনে জাবর রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., আলকামা ইবনে কায়েস আননাখায়ী রহ., সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব আযযুহরী রহ., ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী রহ., আবু বিসতাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ., নাফে মওলা ইবনে উমর রহ., সালেম ইবনে উমর রহ. প্রমুখ এসব যুগের হাদীসের ইমাম। খোদ ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা জগদ্বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। যেমন, ইমাম আহমাদ রহ., আলী ইবনুল মাদীনী রহ., ইবনে আবী শায়বা রহ. প্রমুখ। তবে একথা ঠিক, কোনো কারণে ইমাম বুখারী রহ.-এর প্রসিদ্ধি বেশি হয়। এর অর্থ এই নয়, তাঁর যুগে বা তাঁর আগে কোনো হাদীস বিশারদই ছিলেন না।

ঠিক তেমনি ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.। এঁরা চারজন সমকালীন ফতোয়া ও মাযহাবের ইমাম। তাঁরা আপন যুগ থেকে অদ্যাবধি বিশ্বময় প্রসিদ্ধি লাভ করে আছেন। এর অর্থ এই নয়, ফতোয়া ও মাযহাব এবং ইমাম ও মুফতীর ধারা তাঁদের থেকেই সূচিত, তাঁদের আগে এসব ছিল না; বরং যে এমন ধারণা করে, সে তেমনই অজ্ঞ যেমন কেউ মনে করে, শায়েখ জীলানীর আগে বিশ্বে কোনো আল্লাহর ওলী ছিলেন না।

শায়েখ জীলানীর আগেও বিশ্বে আল্লাহর ওলী ছিলেন এবং ইমাম বুখারীর আগেও যুগে যুগে হাদীস বিশারদ ছিলেন। বিষয়টি সুস্পষ্ট বাস্তবতা, দলিল-প্রমাণ দিয়ে যা বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তেমনিভাবে চার ইমামের আগেও প্রতি যুগেই ফতোয়া ও মাযহাব ছিল। ইমাম ও ফকীহ ছিলেন। এটিও সুস্পষ্ট বাস্তবতা, যা দলিল-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। কারণ তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বাস্তবতা।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকর রা., উমর রা., উসমান রা., আলী রা., মুআয রা., যায়েদ ইবনে ছাবেত রা., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., আয়েশা রা., আবু মুসা আলআশআরী রা., আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ; তাবেয়ীদের মধ্যে মুজাহিদ ইবনে জাব্র রহ., ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস রহ., তাঊস ইবনে কাইসান রহ., আলকামা ইবনে কায়েস রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ., সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., খারিজা ইবনে যায়েদ রহ., মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব আযযুহরী রহ., আতা ইবনে আবী রবাহ রহ., আমের ইবনে শারাহীল আশশা'বী রহ., ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী রহ., হাসান বসরী রহ., মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ., উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ., কাজী শুরাইহ্ ইবনে হারেস রহ., কাতাদা ইবনে দিআমা আস্সাদূসী রহ., হাকাম ইবনে নাফে' রহ., লাইস ইবনে সা'দ রহ., সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ., সালেম ইবনে উমর রহ., আবু সালামা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রহ. প্রমুখ তাবেয়ী চার ইমামের আগে স্ব স্ব যুগের ও অঞ্চলের ফকীহ ও ইমাম ছিলেন। আর তাঁদের ফতোয়াগুলোই হল তাঁদের মাযহাব।

ইবনে জারীর তাবারী রহ.-এর বক্তব্য ইবনুল কায়্যিম রহ. উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলেছেন, মদীনার মানুষ যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.-এর মাযহাব অনুসারেই ফতোয়া দিত এবং তাই মানত।
ইবনুল কায়্যিম রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থে এক মাসআলা বর্ণনার পর বলেন-

وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَطَاؤُوْسٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ، قَالَ ابْنُ حَزَمٍ:
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَعَدِيُّ
بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ .

‘এটি হাসান বসরী রহ., তাউস বিন কাইসান রহ., ইকরিমা রহ., কাতাদা রহ. ও হাকাম রহ.-এর মাযহাব।

ইবনে হাযম রহ. বলেন, এটি উমর ইবনুল খাত্তাব রা., জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. ও ইবনে আব্বাস রা.-এর কওল ও মাযহাব। আর এমনটিই বলেছেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ., হাকাম বিন উতাইবা রহ., সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ., উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ., আদী ইবনে আদী আলকিন্দী রহ., শা‘বী রহ. প্রমুখ। অর্থাৎ এটাই তাঁদের মাযহাব।’ যাদুল মাআদ ৫/১২৬

এখানে যে কয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সবাই সাহাবী বা তাবেয়ী এবং সবার মাযহাবই উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি যাদুল মাআদ-এর অন্যত্র আরো বলেন-

وَهٰذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَطَاؤُوْسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوْيَهْ.

‘এটি ইবনে আব্বাস রা. (সাহাবী) জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. (সাহাবী) তাউস রহ., মুজাহিদ ইবনে জাব্র রহ., হাসান বসরী রহ., কাতাদা রহ., হাকাম রহ. (সবাই তাবেয়ী) ইসহাক ইবনে রাহুয়া রহ.-এর মাযহাব। (এখানে ইসহাক রহ. ছাড়া বাকিরা সবাই হয় সাহাবী না হয় তাবেয়ী।)’ যাদুল মাআদ ১/৫১২

তিনি অন্য কিতাবে আরেকটি মাসআলায় বলেন-

فَإِنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ.

'এটি আবু হুরায়রা রা., উমর ইবুল খাত্তাব রহ., তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ রা., আমর ইবনুল আস রা., আনাস রা., মুআবিয়া রা., আয়েশা রা., আসমা রা.-এর মাযহাব।' তাহযীবু সুনানে আবী দাউদ ২/২৮৫

এঁদের সবাই সাহাবী।

তিনি অন্যত্র আরো বলেন-

مَذْهَبُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ .

'খুলাফায়ে রাশেদীনের মাযহাব।' তাহযীবু সুনানে আবী দাউদ ২/২২১

> আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এক মাসআলায় বলেন-
>
> هٰذَا مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ .

'এটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাযহাব।'

আরেক মাসআলায় বলেন-

وَهُوَ مَذْهَبُ كَثِيْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ .

'এটি অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাযহাব।' মাজমূউল ফাতাওয়া ২৫/৯৯

ইমাম ইবনুল মুনযির রহ. এক মাসআলায় বলেন-

وَهٰذَا مَذْهَبُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَطَاؤُوْسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ وَمُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالزُّهْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى .

'এটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ., মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ., তাউস রহ., আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ রহ., মুসা ইবনে তালহা রহ., উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ., যুহরী রহ. ও আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা রহ.-এর মাযহাব।' আলইশরাফ ৬/২৬১

এঁদের সবাই তাবেয়ী।

অন্যত্র আরো বলেন-

وَرُوِيَ هٰذَا الْمَذْهَبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمُجَاهِدٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ .

'এ মাযহাবটি ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত। আর এটি আতা রহ., হাসান বসরী রহ., মুজাহিদ রহ., ইবরাহীম নাখায়ী রহ. ও যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম রহ.-এর মাযহাব।' প্রাগুক্ত

ইমাম বাইহাকী রহ. এক মাসআলায় লেখেন-

هُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمَذْهَبُ عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

'এটি আয়েশা রা.-এর মাযহাব এবং আরো কিছু সাহাবীর মাযহাব।' সুনানে বাইহাকী ১০/৬৫

প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম শামসুল হক আযীমাবাদী এক মাসআলায় লেখেন-

هُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ وَطَاؤُوْسٍ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ .

‘এটি আয়েশা রা., ইবনে মাসউদ রা., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. (সাহাবী) আতা রহ., তাউস রহ., সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., লাইস ইবনে সা'দ রহ. (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর)-এর মাযহাব।' আউনুল মাবুদ ৬/৪৮

এ ধরনের শত শত বক্তব্য উল্লেখ করা যাবে। বিষয়টি যেকোনো আহলে ইলমের কাছে সামান্যতমও অস্পষ্ট নয়। তাই নমুনাস্বরূপ এ কয়টি বক্তব্য উল্লেখ করা হল।

অনেক হাদীস বিশারদ হাদীসের কিতাব সংকলন করতে গিয়ে এসব মাযহাবও উল্লেখ করেছেন। এই যে ইমাম বুখারী রহ., তাঁর হাদীসের কিতাব সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। তাঁর সংকলনটি হাদীসবিষয়ক হলেও তিনি এতে এসব মাযহাবও উল্লেখ করেছেন। প্রায় শিরোনামে قَالَ الْحَسَنُ (হাসান বসরী রহ. বলেছেন) قَالَ إِبْرَاهِيمُ (ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেছেন) ইত্যাদি বলে যেসব বিষয় উল্লেখ করেন তার সবই এসব ব্যক্তির মাযহাব। ইমাম তিরমিযী রহ. তো ঘোষণা দিয়েই এসব মাযহাব উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদে হাদীসের পর পর সমকালীন ও পূর্ববর্তী আহলে ইলমদের মাযহাব উল্লেখ করেন। সেসব আহলে ইলম হলেন সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী ইমাম।

ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ ইবনে আবী শায়বা রহ. এবং উস্তাদের উস্তাদ আব্দুর রায্যাক রহ. তাঁদের ‘মুসান্নাফ’ লিখেছেন হাদীসের সঙ্গে এসব মাযহাব সংকলনের জন্য। বরং দ্বিতীয় শতাব্দী ও তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকের প্রায় হাদীসের কিতাব এ প্রকৃতির ছিল। তখন হাদীসের সঙ্গে এসব মাযহাব সংকলন করা দায়িত্ব ও কৃতিত্ব মনে করা হত। মুআত্তা মালেক, মুআত্তা মুহাম্মাদ, কিতাবুল হুজ্জাহ, কিতাবুল আছার, কিতাবুল আমওয়াল (আবু উবায়দ) কিতাবুল খারাজ, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর, মুসনাদে দারেমী, কিতাবুল উম্ম (শাফেয়ী) প্রভৃতি কিতাবে (যেগুলো ইমাম বুখারী রহ.-এর আগেকার)। এসব মাযহাবকে হাদীসের মতো গুরুত্বের সঙ্গে সংকলন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়েও হাদীসের অনেক কিতাবে এসব মাযহাব সংকলন করা হয়েছে। যেমন, শরহু মাআনিল আছার, সুনানে বাইহাকী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল-আছার ইত্যাদি।

হাদীসের যত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে সেসব কিতাবেও হাদীসের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এসব মাযহাব আবশ্যকীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাআলিমুস সুনান, আলমুফহিম, ইকমালুল মুলিম, আলমিনহাজ (শরহে মুসলিম নববী) ফাতহুল বারী (ইবনে রজব) ফতহুল বারী (ইবনে হাজার) উমদাতুল কারী, নাইলুল আওতার (শাওকানী) সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগুল মারাম, বাযলুল মাজহূদ, ফাতহুল মুলহিম প্রভৃতি হাদীসের শত শত ব্যাখ্যাগ্রন্থে এসব মাযহাব উল্লেখ করা হয়েছে।

> ফিকহের কিতাব আলমুগনী, আলমাজমূ, হেদায়া, বাদায়ে, মাবসূত, ফাতহুল কাদীর প্রভৃতি কিতাবে তো এসব মাযহাব সরাসরি সংকলিত হয়েছেই।

অনুরূপ তাফসীরের কিতাবেও এসব মাযহাব উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন, আহকামুল কুরআন (তহাবী) আহকামুল কুরআন (জাসসাস) আহকামুল কুরআন (কুরতুবী) আহকামুল কুরআন (ইবনুল আরাবী) তাফসীরে ইবনে আতিয়্যা, তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, তাফসীরে তাবারী ইত্যাদি।

অনেক কিতাব শুধু মাযহাব সংকলন ও বিশ্লেষণের জন্যই লেখা হয়েছে। যেমন, আল্লামা ইবনুল মুনযির রহ. (মৃত্যু ৩১৮হি.)-এর কিতাব 'আলইশরাফ আলা মাযাহিবিল উলামা' অর্থাৎ ফকীহ আলেমগণের মাযহাব নিয়ে এ কিতাব রচিত। কিতাবের নামের মধ্যেই মাযহাব শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর আলেমগণ বলতে সাহাবী ও তাবেয়ী উদ্দেশ্য। চার ইমামের নাম তো সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাযহাব উদ্ধৃত করার পর সবশেষে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি কিতাব রচনা করেছেন। নাম দিয়েছেন 'আলআউসাত ফিস সুনান ওয়াল-ইজমা ওয়াল-ইখতিলাফ'।

ইবনুল মুনযির রহ.-এর সমসাময়িক ইমাম তহাবী রহ.ও (মৃত্যু ৩২১হি.) এ বিষয়ে বিশাল এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম দিয়েছেন 'ইখতিলাফুল উলামা'। পরবর্তী সময়ে আল্লামা জাসসাস রহ. তা সংক্ষেপ করে নাম দিয়েছেন 'মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা'। এই কিতাবেও সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে চার ইমাম পর্যন্ত ইমামগণের মাযহাব সংকলন হয়েছে।

উপরিউক্তদের পরে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.ও এ সম্পর্কে কিতাব লিখেছেন। নাম দিয়েছেন

اَلاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الأَقْطَارِ فِيْمَا تَضَمَّنَهُ الْمُوَطَّأُ

مِنْ مَعَانِي الرَّأْيِ وَالْآثَارِ وَشَرْحِ ذٰلِكَ كُلِّهِ بِالْإِيْجَازِ وَالِاخْتِصَارِ.

অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ফুকাহা ও উলামায়ে কেরামের মাযহাব সংকলন সম্পর্কে।

এখানেও ফুকাহা দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবী ও তাবেয়ী। চার ইমামের মাযহাব সব শেষেই উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী রহ.ও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর কিতাবের নাম بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ وَنِهَايَةُ الْمُقْتَصِدِ

ইসলামিক কিতাবভাণ্ডারে এ ধরনের আরো অনেক গ্রন্থ আছে। মোটকথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে সূচিত হয়ে সাহাবী ও তাবেয়ী হয়ে চার ইমাম পর্যন্ত পুরো মুসলিম বিশ্বে মাযহাবের ধারা ছিল বিশাল ও সুবিস্তৃত। সে যুগে এলাকায় এলাকায় যেমন ছিল কুরআনের প্রচলন, ইলমুল হাদীসের প্রচলন, দ্বীন শিক্ষার প্রচলন এবং সে যুগে এসবের প্রচলন যেমন ধ্রুব-সত্য ও নির্জলা বাস্তব, যার দলিল-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তেমনি এসব যুগে মাযহাব ও ফতোয়ার প্রচলনও ধ্রুব-সত্য, যা দলিল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

প্রশ্ন হতে পারে আচ্ছা, চার ইমামের আগে নবীজী পর্যন্ত প্রতি যুগেই মাযহাব ছিল। সাহাবীদের মাযহাব ছিল, তাবেয়ীদের মাযহাব ছিল। চার ইমাম তো তাঁদের পরের। এই চার মাযহাব তো এই চার ইমামের সৃষ্ট ও আবিষ্কৃত। তাহলে আমরা এই চার মাযহাব মানব কেন? আমরা তাদের আগের মাযহাব মানব।

প্রশ্নটির জবাব নিজেদের পক্ষ থেকে না দিয়ে এমন এক ব্যক্তির বরাতে দেওয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে, যিনি মাযহাববিরোধীদের কাছেও প্রিয় আর তার জবাবটিও এমন বাস্তবসম্মত হয়েছে যে, এরপর আর কোনো কথা থাকে না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর যুগে ইবনে মুতাহ্হির আলহিল্লী নামে শিয়া ফেরকার এক ভ্রান্ত লোক ছিল। সে শিয়া মতবাদের পক্ষে বিভিন্ন বই-পুস্তক লেখে। তার মধ্যে বিশেষ একটি পুস্তক হল 'মিনহাজুল কারামাহ ফী ইসবাতিল ইমামাহ'।

এ পুস্তকে সে তার মতবাদ প্রমাণের জন্য এদিক-ওদিক নিস্ফল অনেক অপচেষ্টা করেছে। মুসলমানদের ওপর অনেক ভুল আপত্তি ও প্রশ্ন উঠিয়েছে। এসব প্রশ্নের মধ্যে এটাও একটা যে, এ চার মাযহাব নতুন সৃষ্টি। নবীজী ও সাহাবীদের যুগে এগুলো ছিল না। তার এসব মিথ্যা-বানোয়াট দেখে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এগিয়ে আসেন এবং তার অক্ষরে অক্ষরে জবাব দেন। উক্ত প্রশ্নের জবাবে ইবনে তাইমিয়া রহ. যা বলেছেন তা হুবহু তুলে ধরছি-

قَوْلُهُ:'إِنَّ هٰذِهِ الْمَذَاهِبَ لَمْ تَكُنْ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الصَّحَابَةِ، إِنْ أَرَادَ أَنَّ الأَقْوَالَ الَّتِيْ لَهُمْ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ بَلْ تَرَكُوْا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَابْتَدَعُوْا خِلَافَ ذٰلِكَ، فَهٰذَا كَذِبٌ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَّفِقُوْا عَلَى مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ بَلْ هُمْ وَسَائِرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَّبِعُوْنَ لِلصَّحَابَةِ فِيْ أَقْوَالِهِمْ،

وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ خَالَفَ الصَّحَابَةَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَالْبَاقُوْنَ يُوَافِقُوْنَهُمْ وَيُثْبِتُوْنَ خَطَأَ مَنْ يُخَالِفُهُمْ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ نَفْسَ أَصْحَابِهَا لَمْ يَكُوْنُوْا فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ فَهٰذَا لَا مَحْذُوْرَ فِيْهِ، فَمِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّ كُلَّ قَرْنٍ يَأْتِيْ يَكُوْنُ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ.

اَلْوَجْهُ السَّابِعُ قَوْلُهُ: 'وَأَهْمَلُوْا أَقَاوِيْلَ الصَّحَابَةِ كَذِبٌ مِنْهُ، بَلْ كُتُبُ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ مَشْحُوْنَةٌ بِنَقْلِ أَقَاوِيْلِ الصَّحَابَةِ وَالْاِسْتِدْلَالِ بِهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهَا مَا لَيْسَ عِنْدَ الْأُخْرٰى، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُّ بِذٰلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَقُوْلُوْنَ مَذْهَبَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَنَحْوَ ذٰلِكَ فَسَبَبُ ذٰلِكَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هٰؤُلَاءِ جَمَعَ الْآثَارَ وَمَا اسْتَنْبَطَهُ مِنْهَا فَأُضِيْفَ ذٰلِكَ إِلَيْهِ كَمَا تُضَافُ كُتُبُ الْحَدِيْثِ إِلٰى مَنْ جَمَعَهَا كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِيْ دَاوُدَ وَكَمَا تُضَافُ الْقِرَاءَاتُ إِلٰى مَنِ اخْتَارَهَا كَنَافِعٍ وَابْنِ كَثِيْرٍ، وَغَالِبُ مَا يَقُوْلُهُ هٰؤُلَاءِ مَنْقُوْلٌ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ وَفِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ مَا لَيْسَ مَنْقُوْلًا عَمَّنْ قَبْلَهُ لٰكِنَّهُ اسْتَنْبَطَهُ مِنْ تِلْكَ الْأُصُوْلِ ثُمَّ قَدْ جَاءَ بَعْدَهُ مَنْ تَعَقَّبَ أَقْوَالَهُ فَبَيَّنَ مِنْهَا مَا كَانَ خَطَأً عِنْدَهُ، كُلُّ ذٰلِكَ حِفْظًا لِهٰذَا الدِّيْنِ حَتّٰى يَكُوْنَ أَهْلُهُ كَمَا وَصَفَهُمُ اللّٰهُ بِهِ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَمَتٰى وَقَعَ مِنْ أَحَدِهِمْ مُنْكَرٌ خَطَأً أَوْ عَمَدًا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.)

'তার যে উক্তি 'এসব মাযহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের যুগে ছিল না'এর দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য এই হয় যে, এসব মাযহাবের ফতোয়া ও সমাধানগুলো নবীজী ও সাহাবী থেকে বর্ণিত নয়, বরং ইমামগণ নবীজী ও সাহাবীদের বক্তব্য ও ফতোয়া প্রত্যাখান করে তার বিপরীতে এগুলো তারা নতুন আবিষ্কার করেছেন, তাহলে এটা ইমামদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হবে। কেননা, এসব ইমাম সাহাবীদের বিরোধিতা করার জন্য কখনো একজোট হননি; বরং তারা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর সবাই সাহাবীদের ফতোয়ার অনুসারী।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয়, আহলুস সুন্নাহর কেউ অজ্ঞাতসারে সাহাবীদের ফতোয়ার বিরোধিতা করেছেন, তাহলে আহলুস সুন্নাহর বাকি সবাই সাহাবীদের ফতোয়া গ্রহণ করেছেন আর যে ব্যক্তি সাহাবীদের বিরোধিতা করেছে তার ভুল ধরে দিয়েছেন।

আর যদি এসব মাযহাব নবী ও সাহাবী যুগে ছিল না বলে তার উদ্দেশ্য এই হয় যে, এসব মাযহাবের ইমামগণ নবী ও সাহাবীদের যুগে ছিলেন না, তাহলে এই না থাকাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, চার ইমাম তো পরবর্তী যুগের। আর জানা কথা, পরবর্তী যুগ প্রথমযুগের পরেই আসে।

আর তার যে উক্তি 'এসব মাযহাবের ইমাম সাহাবীদের ফতোয়া বাদ দিয়েছেন'এটাও তাদের ওপর একটি মিথ্যা রটনা। কেননা, মাযহাবের কিতাবসমূহে সাহাবীদের ফতোয়া এবং তা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের বিবরণ দ্বারা ভরপুর।

আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় এই আপত্তি তোলা যে, চার মাযহাবের ফতোয়া ও সমাধানগুলো যদি সাহাবীদের থেকে বর্ণিত, তাহলে তারা আবু হানীফার মাযহাব, মালেকের মাযহাব ইত্যাদি বলে, কিন্তু আবু বকরের মাযহাব, উমরের মাযহাব বলে না কেন? তো এর কারণ হল, ইমামদের সবাই হাদীস ও সাহাবীদের ফতোয়া সংকলন করেছেন। পাশাপাশি এসব হাদীস ও ফতোয়া থেকে যেসব মাসআলা ইস্তেম্বাত ও উদ্ভাবন হয় তাও একত্র করেছেন। তাই সেসব সংকলনকে তাদের ইমামদের দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। যেমন, হাদীসের কিতাবগুলোকে তার সংকলনকারীর দিকে সম্বন্ধ করা হয় এবং বলা হয় বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদি।

মূলত এসব ইমাম যা বলেছেন, তার অধিকাংশই পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত। হ্যাঁ, তাদের কারো কাছে এমন কিছু পাওয়া যায়, যা আগে থেকে বর্ণিত হয়ে আসেনি। কিন্তু সেগুলো তারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত উসূল ও মূলনীতির আলোকেই গবেষণা করে নির্ণয়

করেছেন। এই গবেষণায় ভ্রান্তি হলে পরবর্তীরা তা শুধরে দেন। এ সবকিছুই আল্লাহ তাআলার দ্বীন রক্ষার্থে, যেন দ্বীনের অনুসারীরা এমন হয় যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে 'তারা ভালো বিষয়ে আদেশ দেয় এবং মন্দ বিষয়ে বাধা দেয়।' তাই যখনই দ্বীনের অনুসারীদের কারো থেকে কোনো মন্দ প্রকাশ পায়, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরা তা শুধরিয়ে দেয়।' মিনহাজুস সুন্নাতিন নববিয়্যাহ ৩/১৭৪-১৭৫

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বক্তব্য একদম পরিষ্কার। আহলে ইলমের কাছে তার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তবে এই প্রশ্নোত্তর থেকে যে কয়টি বিষয় প্রতিভাত হয়, তা খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার, তাই কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

এক. চার মাযহাব বেদআত বা নব-আবিষ্কৃত—এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর অভিযোগ নয়। এটা ভ্রান্ত শিয়া রাফেযীদের উদ্ভট অভিযোগ, যা ইসলামের মূলধারাকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়ার জন্য তোলা হয়েছে।

দুই. তাদের এই অভিযোগ একেবারেই ভ্রান্ত। কেননা, এসব মাযহাব চার ইমাম আবিষ্কার করেছেন বিষয়টি এমন নয়; বরং এগুলো আগে থেকে চলে আসা ধারাবাহিক ফতোয়া। ইমামগণ এগুলো সংকলন করেছেন এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আগে থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসা উসূল ও মৌলনীতির আলোকে ইস্তেম্বাত ও গবেষণাকৃত আরো কিছু মাসআলা। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বিষয়টি বলিষ্ঠভাবে বুঝিয়েছেন।

তিন. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এক্ষেত্রে যে উদাহরণগুলো পেশ করেছেন, সেগুলো বুঝলেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে জবাবটি লিখেছেন বলে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত দিয়ে চলে গেছেন। তাই সেগুলো আরেকটু ব্যাখ্যাসহ বলছি।

হাদীসের উৎস নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীন শেখাতেন। তাঁরা তা যথাযথভাবে শিখতেন। এগুলোই হাদীস। কোনো কোনো সাহাবী তা লিখেও নিতেন। সাহাবায়ে কেরামের সবাই এভাবে নবীজী থেকে দ্বীন শেখেন। নবীজীর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই তাদের পরবর্তীদের দ্বীন শেখান। তাঁরা নবীজী থেকে যা শুনেছেন, যা দেখেছেন বা মৌন সমর্থন পেয়েছেন, দ্বীনের এ সব কিছু তাবেয়ীদেরকে শেখান। তাবেয়ীদের মাঝে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে তা লিখে নিতেন।

এভাবে প্রত্যেক প্রজন্ম তার পরবর্তীদের হাদীস শেখান। প্রত্যেক প্রজন্মেই হাদীসের চর্চা ছিল। মুসলমানরা সে হাদীস মতে দ্বীন পালন করে আসছিল। এক সময় মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীস কিতাবে সংকলন করে নেন। যেমন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আহমাদ রহ. প্রমুখ। আর সেসব সংকলনকে তাদের দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। যেমন, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ ইত্যাদি। এর অর্থ এই নয়, হাদীসের এই ইমামগণই এসব হাদীস আবিষ্কার করেছেন, আগে এসবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বরং এর অর্থ হল, হাদীসের ধারা সব যুগে সব অঞ্চলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই সূচিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। মুহাদ্দিসগণ শুধু তাদের যুগে এসব হাদীস সংকলন করেছেন মাত্র।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো একটি উদাহরণ পেশ করেন। যেমন, কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের একাধিক পাঠ-পদ্ধতি রয়েছে। এসব পদ্ধতি খোদ নবীজী থেকে গৃহীত ও সূচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন

‘একদিন এক ব্যক্তিকে আমি একটি আয়াত পড়তে শুনি। কিন্তু নবীজী থেকে আয়াতটি আমি যেমন শিখেছি সে তার ব্যতিক্রম পড়ছে। তাই তাকে নবীজীর কাছে নিয়ে যাই এবং বিষয়টি নবীজীকে বলি। এতে আমি তাঁর চেহারা মুবারকে অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পাই। তখন নবীজী বললেন, তোমাদের দুজনের পড়াই সঠিক। তোমরা মতবিরোধ করো না। তোমাদের আগেকার লোকেরা মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।’ সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৪৭৬

বস্তুত, এধরনের পাঠ-পদ্ধতি বা কেরাত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই শেখানো। নবীজীর যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে তা তেলাওয়াত ও চর্চিত হয়ে আসছে। এভাবে আসতে আসতে দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে কেরাত সম্পর্কে অভিজ্ঞ কিছু আলেম নিজ নিজ কেরাত সংকলন করে নেন বা তার দ্বারা সেটির প্রচার-প্রসার ও তালীম বেশি ঘটে। তখন যে কেরাত যিনি সংকলন করেন সেটি তার দিকেই সম্বন্ধিত হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন নাফে‘ ইবনে আব্দুর রহমান রহ.। তিনি কেরাতের ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর ইমাম (মৃত্যু ১২০ হিজরী)। আরেকজন হলেন আসেম ইবনু আবীন্ নাজূদ রহ.। তিনি কুফাবাসীর ইমাম (মৃত্যু ১২৮ হিজরী)। এরূপ আরো আছেন। আর কেরাতগুলো পরবর্তী সময়ে তাদের নামেই নামকরণ করা হয়। যেমন, বলা হয় নাফে‘র কেরাত, ইবনে কাসীরের কেরাত, আসেমের কেরাত ইত্যাদি।

সুতরাং এর অর্থ এই নয়, এরাই এ কেরাতগুলোর আবিষ্কারক বা এসব কেরাত বেদআত কিংবা পরবর্তীদের সৃষ্টি। বরং এসব কেরাতের সূচনা নবীজী থেকেই এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিক ধারায় তা চলে এসেছে। আর এরা এসবের জামে‘ বা সংকলক মাত্র বা নাশির ও প্রচার-প্রসারকারী মাত্র।

তো আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. চার মাযহাবকে এদুটি বিষয় (হাদীসের কিতাব ও কেরাত)-এর সঙ্গে উপমা দেন। যার সরল ও স্পষ্ট অর্থ এই চার মাযহাব নবআবিষ্কৃত নয়, বরং এর ধারা নবীজী থেকেই সূচিত। পরবর্তী সময়ে প্রতি যুগে অবিচ্ছিন্নধারায় প্রবাহিত ও বর্ণিত। যেমন, হাদীস ও কেরাত। অর্থাৎ এসব মাযহাবের মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম ইমামদের আবিষ্কৃত নয়, বরং এগুলো নববী-যুগ থেকেই চলে এসেছে। পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরামের কাছে এসব হুকুম-আহকাম ছিল। তাঁরা সে মোতাবেক ফতোয়া দিতেন। সেগুলো তাঁদেরও মাযহাব। তাঁদের পরবর্তীতে তাবেয়ীনের যুগেও এগুলো ছিল। তাই এগুলো তাবেয়ীনেরও মাযহাব। এভাবে আসতে আসতে চার ইমাম পর্যন্ত আসে। তাঁদের পর্যন্ত এলে তাঁরা আগের মাযহাবগুলো সংকলন করে নেন। এগুলোর সঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত মাযহাব ও ফতোয়াসমূহের আলোকে নিজেরা আরো অনেক মাসআলা ইস্তেম্বাত ও উদঘাটন করেন। তাই পরবর্তী লোকেরা এসব মাযহাবকে এর সংকলকদের (চার ইমামের) প্রতিই সম্বন্ধ করে বলে থাকে হানাফী মাযহাব, শাফেয়ী মাযহাব প্রভৃতি।

উদাহরণস্বরূপ, মুক্তাদীর সূরা ফাতেহাসহ কোনো কেরাতই না পড়া ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব। এটি তাঁর আগে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ., ইবরাহীম নাখায়ী রহ., কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রহ., আলকামা ইবনে কায়েস রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., আবু ওয়ায়িল শাকীক ইবনে সালামা রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কায়েস আননাখায়ী রহ. প্রমুখ তাবেয়ীর মাযহাব। তাঁরা সবাই এমনটি বলেছেন। আর তাঁদেরও আগে হযরত উমর রা., হযরত আলী রা., ইবনে মাসউদ রা., ইবনে উমর রা., জাবের রা., সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা., যায়েদ বিন ছাবেত রা., ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ সাহাবী এমনটি বলেছেন। অর্থাৎ এটি তাঁদেরও মাযহাব। আর জানা কথা যে, এত বড় বড় সাহাবী নবীজী থেকে এমন শিক্ষা না পেলে এমন ফতোয়া দিতে পারতেন না এবং নিজেরাও এর ওপর আমল করতে পারতেন না। হযরত উমর রা. ও হযরত আলী রা. তো কোনো মুক্তাদী কেরাত পড়লে তার প্রতি খুব কঠোরতা করতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/২৭৩

মোটকথা, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বক্তব্য ও উদাহরণ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার যে, এসব মাযহাব নব আবিষ্কৃত বা বেদআত নয় এবং তাঁর এই আলোচনা দ্বারা মাযহাবের বাস্তব ইতিহাস পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বাস্তব তো বাস্তবই, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এ পর্যায়ে মুনাসিব মনে হচ্ছে, এখানে আরেকজন বরেণ্য ব্যক্তির বক্তব্য পেশ করি, যিনি হাদীসের জগতে এক মহীরুহ, ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ, বরং ইমাম বুখারী যাঁর হাতে গড়া, তিনি হলেন ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (মৃত্যু ২৩৪ হি.)। তাঁর বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী।

চার ইমামের চার মাযহাব পরবর্তী সময়ে যেমন চারটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়, চার ইমামের যেমন অনেক শাগরেদ মিলে মাযহাব সংকলন করে এবং তা প্রচার-প্রসার করে, নিজেরা সে মোতাবেক ফতোয়া দেয় এবং সে মাযহাবের অনেক প্রাজ্ঞ শাগরেদ তৈরি করেএভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, সাহাবীদের নিজেদের যুগেও এ ধরনের মাযহাব চালু ছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ফিকহ ও প্রজ্ঞায় বড় মাপের ছিলেন, তাঁদের একেকটি মাযহাব বড় বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁদের অনেক শাগরেদ ও ছাত্র তৈরি হয়, যারা তাঁদের মাযহাব সংকলন করে। এরপর তা প্রচার-প্রসার ঘটায়। এরপর এরাও অনেক শিষ্য-শাগরেদ তৈরি করে, যারা নিজেদের যুগে তা প্রচার করে। এভাবে সোনালি যুগে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সেসব মাযহাব অব্যাহত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর আরবী পাঠ এই-

قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ لَهُ أَصْحَابٌ يُفْتُوْنَ بِقَوْلِهِ فِي الْفِقْهِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَصْحَابٌ يَقُوْمُوْنَ بِقَوْلِهِ وَيُفْتُوْنَ النَّاسَ.

وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُوْنَ بِقِرَاءَتِهِ وَيُفْتُوْنَهُمْ بِقَوْلِهِ وَيَذْهَبُوْنَ مَذْهَبَهُ: عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ وَالأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ وَمَسْرُوْقُ بْنُ الأَجْدَعِ وَعَبِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَعَمْرُو بْنُ شَرَحْبِيْلَ وَالْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ سِتَّةٌ، هٰؤُلَاءِ عَدَّهُمْ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ الَّذِيْنَ يُقْرِئُوْنَ النَّاسَ بِقِرَائَتِهِ وَيُفْتُوْنَهُمْ سِتَّةٌ: عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ وَمَسْرُوْقٌ ... يعد هٰؤُلَاءِ السِّتَّةَ،وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ الْكُوْفَةِ بِأَصْحَابِ عَبْدِاللهِ وَطَرِيْقَتِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ إِبْرَاهِيْمُ وَالشَّعْبِيُّ إِلَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ يَذْهَبُ مَذْهَبَ مَسْرُوْقٍ يَأْخُذُ عَنْ عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَغَيْرِهِمْ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَذْهَبُ مَذْهَبَ أَصْحَابِهِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ هٰؤُلَاءِ.

كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ وَسُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ أَعْلَمَ أَهْلِ الْكُوْفَةِ بِمَذْهَبِ عَبْدِاللهِ وَطَرِيْقِهِ، وَالْحَكَمُ بَعْدَ هٰذَيْنِ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهٰذَيْنِ وَبِحَدِيْثِهِمْ وَبِطَرِيْقِهِمْ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ يُحِبُّ سُفْيَانَ وَيُحِبُّ هٰذَا الطَّرِيْقَ وَلَا يُقَدِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدًا.

وَكَانَ أَصْحَابُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِيْنَ يَذْهَبُوْنَ مَذْهَبَهُ فِي الْفِقْهِ وَيَقُوْلُوْنَ بِقَوْلِهِ هٰؤُلَاءِ الإِثْنَي عَشَرَ، كَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَقِيَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَلْقَهُ، كَانَ مِمَّنْ لَقِيَهُ مِنْ هٰؤُلَاءِ الإِثْنَي عَشَرَ: قَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. وَكَانَ مِمَّنْ يَقُوْلُ بِقَوْلِهِ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ لِقَاؤُهُ مِثْلُ هٰؤُلَاءِ الأَرْبَعَةِ: سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَقَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِهٰؤُلَاءِ الإِثْنَي عَشَرَ وَمَذْهَبِهِمْ وَطَرِيْقِهِمْ: ابْنُ شِهَابٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَأَبُو الزِّنَادِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ هٰؤُلَاءِ يَذْهَبُ هٰذَا الْمَذْهَبَ وَيَقُوْمُ بِهٰذَا الأَمْرِ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَكَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَعَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ، وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُحِبُّ ذَا الطَّرِيْقَ وَيَذْهَبُ ذَا الْمَذْهَبَ وَلَا يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا.

وَكَانَ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ سِتَّةً، قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُوْلُ أُرَاهُ قَالَ: أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ سِتَّةٌ بَعْدَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ بِقَوْلِهِ وَيُفْتُوْنَ بِهِ وَيَذْهَبُوْنَ مَذْهَبَهُ هٰؤُلَاءِ السِّتَّةُ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ. وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهٰؤُلَاءِ وَبِطَرِيقِهِمْ وَبِهٰذَا الْمَذْهَبِ: عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ قَدْ لَقِيَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ يَذْهَبُ هٰذَا الْمَذْهَبَ وَيُفْتِي بِذَا الْفُتْيَا إِلَّا أَنَّهُ لَقِيَ بَعْضَ هٰؤُلَاءِ وَلَمْ يَلْقَ بَعْضَهُمْ، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهٰؤُلَاءِ وَبِطَرِيقِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.

অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা ফতোয়া দিতেন তাঁদের তিনজন এমন ছিলেন, যাঁদের অনেক ছাত্র ছিল। সেসব ছাত্র তাঁদের ফতোয়া সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করত এবং সে অনুসারে ফতোয়া প্রদান করত-

এক. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.।

দুই. যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.।

তিন. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্ররা, যারা তাঁর কেরাত বা পাঠ-পদ্ধতি অনুসারে কুরআন পড়তেন, মানুষকে তাঁর ফতোয়া অনুসারে ফতোয়া দিতেন এবং তাঁর ‘মাযহাব’ অনুসরণ করতেন, তারা হলেন আলকামা ইবনে কায়েস রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ., মাসরূক ইবনে আজদা‘ রহ., আবীদাহ আস্সালমানী রহ., আম্র বিন শুরাহ্বীল রহ. ও হারিস বিন কায়েস। তারা মোট ছয়জন।

কুফাবাসীর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রদের 'মাযহাব' ও ফতোয়া সম্পর্কে সবচে বেশি জ্ঞাত ছিলেন ইবরাহীম রহ. ও শা'বী রহ.। তবে শা'বী মাসরুকের 'মাযহাব' অনুসরণ করতেন। কখনো কখনো তিনি আলী রা., আহলে মদীনা এবং অন্যদের ফতোয়াও অনুসরণ করতেন। কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ী রহ. শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রদের 'মাযহাব'ই অনুসরণ করতেন।

এই দুইজনের পরে আবু ইসহাক রহ. ও সুলাইমান আলআ'মাশ রহ.-ই হলেন কুফাবাসীর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর 'মাযহাব' ও তাঁর ফতোয়ারীতি সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞাত। এই দুইজনের পরে হাকাম রহ.।

আর সুফিয়ান রহ. হলেন এই দুইজন এবং তাদের হাদীস ও ফতোয়ারীতি সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞাত। (হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বিশেষ উস্তায, সহীহ বুখারীর রাবীদের অন্যতম) ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আলকাত্তান রহ. সুফিয়ান রহ.কে ভালোবাসতেন, তাঁর ফতোয়ারীতি পছন্দ করতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রদের ধারা অনুসরণ করতেন। বরং তিনি অন্য কোনো ফতোয়া তাদের ফতোয়ার ওপর প্রাধান্য দিতেন না।

যায়েদ বিন ছাবেত রা.-এর অনুসারীরা, যারা ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর 'মাযহাব' অনুযায়ী চলতেন, তাঁর ফতোয়া সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করতেন এবং সে মোতাবেক ফতোয়া দিতেন, তারা হলেন বারোজন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তারা হলেন কাবীসা ইবনে যুআইব রহ., খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবেত রহ., আবান ইবনে উসমান রহ., সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ.। আর যারা তাঁর কথা সংরক্ষণ করতেন, কিন্তু তাঁর সংশ্রব ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারেননি, তারা হলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান রহ. ও কাবীসা ইবনে যুআইব রহ.।

এই বারোজনের পরে তাদের 'মাযহাব' এবং ফতোয়ারীতি সম্পর্কে মদীনাবাসীর মধ্যে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ হলেন ইবনে শিহাব রহ., ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলআনসারী রহ., আবুয যিনাদ রহ. ও আবু বকর ইবনে হাযম রহ.।

আর তাদের পর যারা তাদের 'মাযহাব' মেনে চলেছেন এবং এই মাযহাব প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তারা হলেন মালেক ইবনে আনাস রহ., কাসীর ইবনে ফারকাদ রহ., মুগীরা ইবনে আব্দুর রহমান আলমাখযূমী রহ., আব্দুল আযীয ইবনে আবী সালামা আলমাজিশূন রহ.। (হাদীসশাস্ত্রের বড় পণ্ডিত ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনীর বিশেষ শায়েখ) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. এ ধারাটি পছন্দ করতেন এবং এই 'মাযহাব' অনুযায়ী চলতেন। বরং এক্ষেত্রে অন্য কারো ফতোয়া তিনি গ্রহণ করতেন না।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ছাত্ররা, যারা তাঁর 'মাযহাব' অনুসারে চলতেন, তা সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করতেন এবং তাঁর ফতোয়া মোতাবেক ফতোয়া দিতেন, তারা হলেন ছয়জন সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ., জাবের ইবনে যায়েদ রহ., তাউস রহ., মুজাহিদ রহ., আতা রহ. ও ইকরিমা রহ.।

তাদের পর যিনি তাদের সম্পর্কে এবং তাদের 'মাযহাব' ও ফতোয়ারীতি সম্পর্কে সর্বাধিক জানতেন তিনি হলেন আম্র ইবনে দীনার রহ.। তিনি তাদের সবাইকে দেখেছেন। আর ইবনে আবী নাজীহ রহ. এই মাযহাব মানতেন এবং তাদের ফতোয়া মোতাবেক ফতোয়া দিতেন। তবে তিনি তাদের সবাইকে দেখেননি।

আর তাদের পরে তাদের সম্পর্কে এবং তাদের ফতোয়ারীতি ও 'মাযহাব' সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন (প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ও মক্কার মুফতী) ইবনে জুরাইজ রহ. ও সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.।

আলইলাল ওয়া-মারিফাতুর রিজাল, ইবনুল র্বারা-এর রেওয়ায়েত ৭২-৭৫

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এখানে প্রসিদ্ধ তিন সাহাবীর ফতোয়া ও মাযহাবের ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম কারা এসব মাযহাব প্রচার-প্রসার করেছেন, তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। আর তারা হলেন স্ব স্ব যুগের ইমাম ফকীহ মুহাদ্দিস ও দ্বীনের স্তম্ভ। এর দ্বারা আরো সুস্পষ্ট যে, এই মাযহাব নব-আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়। বরং তা সাহাবায়ে কেরাম থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসা বিষয়। আর সাহাবায়ে কেরাম তা শিখেছেন খোদ নবীজী থেকে।

এখানে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-

اَلدِّيْنُ وَالْفِقْهُ وَالْعِلْمُ انْتَشَرَ فِي الأُمَّةِ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَصْحَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعِلْمُ النَّاسِ عَامَّتُهُ عَنْ أَصْحَابِ هٰؤُلَاءِ الأَرْبَعَةِ.

অর্থাৎ গোটা উম্মতের মাঝে দ্বীন, ফিক্হ, ইলম প্রসারিত হয়েছে সাহাবী ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে ছাবেত, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা.-এর ছাত্রদের দ্বারা। তাই আজকের গোটা উম্মতের ইলম এদের থেকেই নিঃসৃত। তাহলে পরিষ্কার হল যে, গোটা উম্মতের ইলম যাদের থেকে নিঃসৃত হয়েছে তাদের মাযহাব ছিল। আর যাদের মাধ্যমে ইলম গোটা উম্মতে প্রসারিত হয়েছে তারা সবাই মাযহাব মানত এবং প্রচার-প্রসারও করত। আর গোটা উম্মতের ইলম মাযহাব-অনুসারীদের থেকেই নিঃসৃত হয়। ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন ১/৩৮

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর উক্ত উদ্ধৃতি থেকে মাযহাবের সূত্র ও ধারা পরিষ্কার হওয়ার পাশাপাশি তাতে আরো দুটি বিষয় লক্ষণীয়-

এক. সালাফের প্রতিটি যুগেই যে মাযহাব ছিল, তা ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর উক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। মাযহাবের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে অন্যরা 'ফতোয়া' শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. সরাসরি মাযহাব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেই মাযহাবের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তাই তিনি প্রথমেই বলেন, মুফতী সাহাবীদের মধ্যে তিনজন সাহাবী এমন ছিলেন যাঁদের ছাত্র ছিল, ছাত্ররা তাঁদের মাযহাব মানত, তা সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করত এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করত।

এরপর এই তিনজনের প্রত্যেকের ছাত্রদের নামোল্লেখ করে বলেন, এরা তাদের উস্তাদের মাযহাব মানতেন এবং সে অনুসারে ফতোয়া দিতেন। এরপর তাদের পরবর্তী ধারায় কারা তাদের মাযহাব অনুসারে ফতোয়া দিতেন এবং এরপর কারাএসব ধারা তিনি মাযহাব শব্দেই উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর উদ্ধৃতি অনুবাদ করার সময় তিনি যেখানে যেখানে মাযহাব শব্দ উল্লেখ করেছেন সেখানে আমরা মাযহাব শব্দ দিয়েই তার অনুবাদ করেছি এবং মাযহাব শব্দটি কোট্ করে দিয়েছি।

আমরা যারা আরবী জানি তাদের জন্য তো কোনো অসুবিধা নেই। উদ্ধৃত বক্তব্যের আরবী পাঠ পড়ে নিলেই তাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে; যারা আরবী জানি না, তারা বক্তব্যটির অনুবাদ পুনরায় পড়ে নিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। সুতরাং ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, চার ইমামের আগেই মাযহাব ছিল এবং মাযহাব শব্দের ব্যবহার ছিল।

দুই. মাযহাব শব্দের ব্যাপক ব্যবহার। ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. তাঁর এই ছোট্ট বক্তব্যে মাযহাব শব্দটি প্রায় তেরোবার উল্লেখ করেছেন। এর আগে এধরনের আরেকটি বক্তব্যেও প্রায় নয়বার মাযহাব শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাযহাব বলতে আমরা যা বুঝি তিনিও হুবহু একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।

আমাদের ভাবার বিষয় হল, মাযহাব যদি বেদআত হবে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা সোনালি যুগে থাকার কথা নয়। কেননা তা গোমরাহি। আর তা সমর্থন করে স্বীকৃতির সুরে আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর মতো ব্যক্তিত্ব কীভাবে তা এতবার উল্লেখ করেন।

মাযহাবের উল্লিখিত ইতিহাস একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় এবং একটি স্পষ্ট বাস্তবতা। 'মাযহাব বেদআত' একথা কোনো আহলে ইলম বলতে পারেন না এবং আজ পর্যন্ত কোনো আহলে ইলম বলেনওনি। এধরনের কথা শিয়া-রাফেযী ইসলামের চরম শত্রু বলতে পারে বা ইতিহাস-অজ্ঞ ব্যক্তি বলতে পারে।

দ্বীন ও শরীয়ত এবং ফিকহী মাযহাবসমূহের প্রচার-প্রসারের ইতিহাস ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. যেভাবে পেশ করেছেন ইমাম ইবনে আবী হাতেম রহ.ও (মৃত্যু ৩২৭হি.) খুবই চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইমাম ইবনে আবী হাতেম রহ. মাযহাব শব্দটি উল্লেখ করেননি। নতুবা উভয়ের বক্তব্যে একই বাস্তবতা ফুটে উঠেছে।

তিনি বলেন-

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ابْتَعَثَ مُحَمَّدًا رَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَهُ مَوْضِعَ الْإِبَانَةِ عَنْهُ، فَقَالَ: >وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ<، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: >وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ<.

فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ هُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَهُ، وعَنْ كِتَابِه مَعانِيَ مَا خُوطِبَ بِهِ النَّاسُ، وَمَا أَرادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَعَنٰى فِيْهِ، وَمَا شَرَعَ مِنْ مَعَانِيْ دِيْنِه وَأَحْكَامِه وَفَرَائِضِه وَمُوجِبَاتِه وَآدَابِهِ وَمَنْدُوبِهِ وَسُنَنِهِ الَّتِيْ سَنَّهَا، وَأَحْكَامِهِ الَّتِيْ حَكَمَ بِهَا وَآثَارِهِ الَّتِيْ بَثَّهَا.

فَلَبِثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، يُقِيْمُ لِلنَّاسِ مَعَالِمَ الدِّيْنِ، يُفْرِضُ الْفَرَائِضَ، وَيَسُنُّ السُّنَنَ، وَيُمْضِي الأَحْكَامَ وَيُحَرِّمُ الْحَرَامَ وَيُحِلُّ الْحَلَالَ، وَيُقِيْمُ النَّاسَ عَلٰى مِنْهَاجِ الْحَقِّ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَبَضَهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى آلِهِ أَفْضَلَ صَلَاةٍ وَأَزْكَاهَا، وَأَكْمَلَهَا وَأَذْكَاهَا، وَأَتَمَّهَا وَأَوْفَاهَا فَثَبَتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُجَّةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى خَلْقِهِ بِمَا أَدّٰى عَنْهُ وَبَيَّنَ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَخَاصِّهِ وَعَامِّهِ، وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَمَا بَشَّرَ وَأَنْذَرَ، قال الله عز وجل: >رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ<.

فَأَمَّا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمُ الَّذِيْنَ شَهِدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيْلَ وَعَرَفُوا التَّفْسِيْرَ وَالتَّأْوِيْلَ وَهُمُ الَّذِيْنَ اخْتَارَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصْرَتِهِ وَاِقَامَةِ دِيْنِهِ وَاِظْهَارِ حَقِّهِ فَرَضِيَهُمْ لَهُ صَحَابَةً وَجَعَلَهُمْ لَنَا أَعْلَامًا وَقُدْوَةً، فَحَفِظُوْا عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَلَّغَهُمْ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا سَنَّ وَشَرَعَ وَحَكَمَ وَقَضٰى وَنَدَبَ وَأَمَرَ وَنَهٰى وَحَظَرَ وَأَدَّبَ، وَوَعَوْهُ وَأَتْقَنُوْهُ، فَفَقِهُوْا فِي الدِّيْنِ وَعَلِمُوْا أَمْرَ اللهِ وَنَهْيَهُ وَمُرَادَهُ بِمُعَايَنَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُشَاهَدَتِهِمْ مِنْهُ تَفْسِيْرَ الْكِتَابِ وَتَأْوِيْلَهُ وَتَلَقُّفِهِمْ مِنْهُ وَاسْتِنْبَاطِهِمْ عَنْهُ، فَشَرَّفَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ وَأَكْرَمَهُمْ بِهِ مِنْ وَضْعِهِ إِيَّاهُمْ مَوْضِعَ الْقُدْوَةِ،

فَنَفَى عَنْهُمُ الشَّكَّ وَالْكَذِبَ وَالْغَلَطَ وَالرِّيبَةَ وَالْغَمْزَ وَسَمَّاهُمْ عُدُولَ الْأُمَّةِ، فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾، فَفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ قَوْلَهُ (وَسَطًا) قَالَ: عَدْلًا، فَكَانُوا عُدُولَ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةَ الْهُدَى وَحُجَجَ الدِّينِ وَنَقَلَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَنَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى التَّمَسُّكِ بِهَدْيِهِمْ وَالْجَرْيِ عَلَى مِنْهَاجِهِمْ وَالسُّلُوكِ لِسَبِيلِهِمْ وَالْاِقْتِدَاءِ بِهِمْ، فَقَالَ: ﴿وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ﴾، الْآيَةُ.

ثُمَّ تَفَرَّقَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي النَّوَاحِي وَالْأَمْصَارِ وَالثُّغُورِ وَفِي فُتُوحِ الْبُلْدَانِ وَالْمَغَازِي وَالْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ، فَبَثَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي نَاحِيَتِهِ وَبِالْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مَا وَعَاهُ وَحَفِظَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَمُوا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمْضَوُا الْأُمُورَ عَلَى مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْتَوْا فِيمَا سُئِلُوا عَنْهُ مِمَّا حَضَرَهُمْ مِنْ جَوَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَائِرِهَا مِنَ الْمَسَائِلِ وَجَرَّدُوا أَنْفُسَهُمْ مَعَ تَقْدِمَةِ حُسْنِ النِّيَّةِ وَالْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَقَدَّسَ اسْمُهُ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ الْفَرَائِضَ وَالْأَحْكَامَ وَالسُّنَنَ وَالْحَلَالَ وَالْحَرَامَ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِضْوَانُ اللَّهِ وَمَغْفِرَتُهُ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

فَخَلَفَ بَعْدَهُمُ التَّابِعُونَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَخَصَّهُمْ بِحِفْظِ فَرَائِضِهِ وَحُدُودِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَارِهِ فَحَفِظُوا عَنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَشَرُوهُ وَبَثُّوهُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالسُّنَنِ وَالْآثَارِ وَسَائِرِ مَا وَصَفْنَا الصَّحَابَةَ بِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَأَتْقَنُوهُ وَعَلِمُوهُ وَفَقِهُوا فِيهِ فَكَانُوا مِنَ الْإِسْلَامِ وَالدِّينِ

وَمُرَاعَاةِ أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَهْيِهِ بِحَيْثُ وَضَعَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصَبَهُمْ لَهُ، إِذْ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: >وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ<، الآيَةُ.

ثُمَّ خَلَفَهُمْ تَابِعُو التَّابِعِيْنَ وَهُمْ خَلَفُ الأَخْيَارِ وَأَعْلَامُ الأَمْصَارِ فِيْ دِيْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَقْلِ سُنَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِفْظِهِ وَاتْقَانِهِ، وَالْعُلَمَاءُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالْفُقَهَاءُ فِيْ أَحْكَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفُرُوْضِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো বিশ্বের মানুষের কাছে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রতি এমন এক কিতাব নাযিল করেন, যাতে দ্বীনের সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁকে (নবীজীকে) তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাকারী ও বর্ণনাকারী বানান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(তরজমা) আমি আপনার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে সেসব বিষয় ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।’ সূরা নাহ্ল ৪৪

সুতরাং নবীজী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাকারী। তিনি ব্যাখ্যা করতেন আল্লাহ তাআলার কিতাবের, আদেশ-নিষেধাবলির, কোন আয়াত দ্বারা মানুষকে কী বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন, দ্বীনের মৌলিক আকীদা-বিধান, ফরয-ওয়াজিব, সুন্নত-মুস্তাহাব, আদব প্রভৃতি যা কিছু আল্লাহ তাআলা বিধিবদ্ধ করেছেন।

এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা-মদীনায় তেইশ বছর ছিলেন। দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলি নির্ধারণ করে দেন। ফরযগুলোকে ফরয করেন, সুন্নতকে সুন্নত, হারামকে হারাম করে দেন। এভাবে দ্বীনের সকল হুকুম-আহকাম তাদের মাঝে চালু করেন। মানুষকে কথায় ও কাজে উভয় দিক থেকে সঠিক রাস্তায় ওঠান।

একসময় আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যান। এভাবে নবীজী সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহর প্রমাণে পরিণত হন। এরপর মানুষের ঈমান না-আনার আর কোনো অজুহাত বাকি থাকতে পারে না। যেহেতু নবীজী কালাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং সেগুলোর মুহ্কাম, মুতাসাবিহ, আম-খাস, নাসিখ-মানসূখ, সুসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, '(তরজমা) এসব রাসূল এমন, যাদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলগণের পর আল্লাহর ওপর কোনো অজুহাত বাকি না থাকে।' সূরা নিসা ১৬৫

এরপর সাহাবায়ে কেরাম, যারা সরাসরি ওহী প্রত্যক্ষ করেছেন, সে ওহীর অর্থ-উদ্দেশ্য বুঝেছেন, তাঁরা সে দল যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের সাহচর্যের জন্য, তাঁর সাহায্যের জন্য, তাঁর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁদেরকে আমাদের জন্য হেদায়েতের আলোর মিনার ও অনুসরণীয় বানান। তাই নবীজী যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে পৌঁছিয়েছেন, তাঁরা সেগুলো সংরক্ষণ করেন। নবীজী যা যা বিধান বিধিবদ্ধ করেছেন, আদেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন, কোনো বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন বা ভীতিপ্রদর্শন করেছেনসবই তাঁরা মুখস্থ করেন এবং সংরক্ষণ করেন। এভাবে নবীজী থেকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের উদ্দেশ্য বুঝে নেন। তাঁর কাছ থেকে সরাসরি কুরআনের তাফসীর শেখেন এবং বুঝে নেন। নবীজী যে অর্থ বলতেন তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করতেন এবং আত্মস্থ করতেন। তা ছাড়া তাঁকে জিজ্ঞেস করে করে আরো শিখতেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন এবং তাঁদেরকে পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় বানান। তাঁদের থেকে মিথ্যা, ভুল ও সংশয় দূর করে তাঁদেরকে গোটা উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে সাব্যস্ত করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন-

'(তরজমা) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও।' সূরা বাকারা ১৪৩

তাই তাঁরাই হলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, দ্বীনের ইমাম, দ্বীনের দলিল ও স্তম্ভ, কুরআন সুন্নাহর বাহক ও মুবাল্লিগ। আল্লাহ তাআলা তাঁদের অনুসরণ করতে, তাঁদের তরীকা আঁকড়ে ধরতে, তাঁদের পথে চলতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

'(তরজমা) আর যে মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে।' সূরা নিসা ১১৫

নবীজীর পর সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, শহরে-বন্দরে, সীমান্তে, দেশ জয়ে, জিহাদে ইত্যাদি কাজে ছড়িয়ে পড়েন। তারা যে শহর ও অঞ্চলে যান সেখানে নবীজী থেকে শেখা বিষয়গুলো প্রচার করতে থাকেন। আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে থাকেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যাবতীয় বিষয় নবীজীর শরীয়ত মতোই নির্বাহ করেন। মানুষজন তাঁদের কাছে সমস্যা ও মাসআলা নিয়ে এলে, নবীজী থেকে কোনো কিছু স্পষ্ট জানা থাকলে তাঁরা তা বলতেন, অন্যথায় সমগোত্রীয় অন্যান্য মাসআলার অনুসারে তার জবাব দিতেন। এভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের হালাল-হারাম ও ফরয-সুনান যাবতীয় বিধান শেখাতে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন।

এভাবে একসময় তাঁদের ইন্তেকাল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিজের কাছে নিয়ে নেন। তাঁদের পরে আসেন তাবেয়ীনে কেরাম, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেন। তাঁদেরকে বিধিবিধান, আদেশ-নিষেধ, নবীজীর কথা-বার্তা, চাল-চলনসহ যাবতীয় সংরক্ষণে বিশেষ যোগ্যতা দান করেন। তাঁরা তাঁদের কাছে রেখে যাওয়া সাহাবীদের দ্বীন ও শরীয়তের আমানত

নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করেন। তাঁরা যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁদেরকেও আল্লাহ তাআলা বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

'(তরজমা) এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের (সাহাবীদের) অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।' সূরা তাওবা ১০০

তাঁদের পরে আসেন তাবে-তাবেয়ীন, যাঁরা হলেন উত্তমদের খলীফা, যাঁরা হলেন আল্লাহ তাআলার দ্বীন ও নবীজীর সুন্নাহ সংরক্ষণে ও প্রচারে বিশ্ববরেণ্য আলেম এবং হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধানের ফকীহ। কিতাবুল র্জাহি ওয়াত-তাদীল ১/৫১-৫৬

এরপর ইবনে আবী হাতেম রহ. মক্কা-মদীনা, কুফা-বসরা প্রভৃতি অঞ্চলের ফকীহ কারা ছিলেন তাদের কিছু নাম উল্লেখ করেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম মালেক রহ.-এর নাম উল্লেখ করেন।

ইমাম মালেক রহ. ছিলেন একজন বড় ফকীহ মুহাদ্দিস। তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করে আজও ফিক্বে মালেকী বা মালেকী মাযহাবের চর্চা হয়। 'মুআত্তা' নামে তাঁর হাদীস সংকলন প্রসিদ্ধ। যাতে হাদীস সংকলিত হয়েছে এবং হাদীসের আলোকে তাঁর মাযহাবেরও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিন্যস্ত হয়েছে।

তিনি যখন এই কিতাব সংকলন করেন তৎকালীন মুসলিম খলীফা আবু জাফর তা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করেন যে, আমি চাচ্ছি এই ইলমকে একমাত্র ইলম হিসেবে নির্ধারণ করব। (যাতে গোটা মুসলিম জাহানে এই কিতাব অনুসারে এক রকমেই আমল চালু হয়।) তারপর বিভিন্ন এলাকার আমীরদের প্রতি তা লিখে পাঠিয়ে দেব। তারা এই বিষয়ে জানবে। যে এর খেলাফ করবে তাকে শাস্তির আওতায় আনব।

ইমাম মালেক রহ. তার এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি খলীফাকে যৌক্তিকভাবে বুঝিয়ে বললেন-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَكَانَ يَبْعَثُ السَّرَايَا وَكَانَ يَخْرُجُ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنَ الْبِلَادِ كَثِيْرًا حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ بَعْدَهُ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنَ الْبِلَادِ كَثِيْرًا، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ بَعْدَهُمَا فَفُتِحَتِ الْبِلَادُ عَلٰى يَدَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ يَبْعَثَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمِيْنَ فَلَمْ يَزَلْ يُؤْخَذُ عَنْهُمْ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ إِلٰى يَوْمِهِمْ هٰذَا، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُحَوِّلُهُمْ مِمَّا يَعْرِفُوْنَ إِلٰى مَا لَا يَعْرِفُوْنَ رَأَوْا ذٰلِكَ كُفْرًا وَلٰكِنْ أَقِرَّ أَهْلَ كُلِّ بَلْدَةٍ عَلٰى مَا فِيْهَا مِنَ الْعِلْمِ وَخُذْ هٰذَا الْعِلْمَ لِنَفْسِكَ، فَقَالَ لِيْ: مَا أَبْعَدْتَّ الْقَوْلَ! اُكْتُبْ هٰذَا الْعِلْمَ لِمُحَمَّدٍ.

'দেখুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের মাঝে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বাহিনী প্রেরণ করতেন। নিজেও অভিযানে বের হতেন। তখন বেশি অঞ্চল বিজিত হয়নি। এরপর আবু বকর রা. দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখনো বেশি অঞ্চল বিজিত হয়নি। তাঁদের দুজনের পর উমর রা. খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁর হাতে বহু অঞ্চল বিজিত হয়। তিনি সেসব অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরামকে মুআল্লিম ও শিক্ষক হিসেবে পাঠাতেন। সেসব অঞ্চলের লোকজন সেসব সাহাবী থেকে দ্বীন শিক্ষা করত এবং সে মোতাবেক পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিত। এসব ভূখন্ডের লোকেরা প্রজন্ম পরম্পরায় এভাবে ইলম-আমল শিখে আসছে। এখন আপনি যদি তাদেরকে তাদের মাঝে পরিচিত কোনো বিষয় থেকে অপরিচিত কোনো বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে চান (অর্থাৎ তাদের অঞ্চলের সাহাবীর শিক্ষার বিপরীত অন্য শিক্ষা চাপিয়ে দিতে চান) তাহলে (এতে বিশৃঙ্খলা হবে এবং) তারা এটাকে কুফুরির মতো অপরাধ মনে করবে। অতএব প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীরা, যে যেই ইলমের ওপর রয়েছে আপনি তাদেরকে সেটার ওপরই বহাল থাকতে দিন,

বরং আপনি এই ইলম (ইমাম মালেক রহ.-এর কিতাব) নিজের জন্য গ্রহণ করুন।

ইমাম মালেক রহ.-এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাবে খলীফা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং বলেন-

مَا أَبعَدتَّ الْقَوْلَ، اُكْتُبْ هٰذَا الْعِلْمَ لِمُحَمَّدٍ.

'আপনি অত্যন্ত দূরদর্শী কথা বলেছেন। আপনি এই ইলমকে (আমার ছেলে) মুহাম্মাদের জন্য লিখে দিন।' কিতাবুল জারহি ওয়াত-তাদীল ১/৬৮

ইমাম আবু হাতেম রহ-এর দীর্ঘ বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার যে, দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞান ওহীর দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সূচিত হয়। সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী হয়ে গোটা উম্মতে প্রসারিত হয়। দ্বীনী জ্ঞানের বড় অংশ হল হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধানের জ্ঞান। এটিও একই ধারায় প্রবাহিত। আর হুকুম-আহকাম বা বিধিবিধানের জ্ঞানকে ফিক্হ বলা হয় এবং এই ফিক্হই ফকীহদের ফতোয়া ও মাযহাবগুলোতে সুবিন্যস্ত হয়েছে।

ইমাম মালেক রহ. ও খলীফা আবু জাফরের এই কথোপকথনের মাঝে বহু শিক্ষা ও ফায়েদা রয়েছে। তবে এখানে এ বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, মাযহাব একটি ফিতরী ও সহজাত বিষয়। খাইরুল কুরুনেই একেক অঞ্চলে একেক মাযহাব প্রচলিত ছিল। ইমাম মালেক রহ.ও স্পষ্ট বললেন যে, এর সূচনা সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে হয়েছে। আরো ফুটে ওঠে মাযহাবের বৈচিত্র। মাযহাবের বৈচিত্র সাহাবায়ে কেরাম থেকেই সূচিত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই নিঃসৃত। অতএব মাযহাব ও মাযহাবের বৈচিত্র অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। আর মাযহাবের বৈচিত্রের মাঝেই বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত। মাযহাবের বৈচিত্র তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে।

অনেক সময় অজ্ঞতার দরুন কেউ কেউ প্রশ্ন করেন আচ্ছা, মাযহাব মানা যদি জরুরি হয়, তাহলে ইমামগণ কার মাযহাব মানতেন? আবু হানীফার পিতা কার মাযহাব মানতেন? সাহাবায়ে কেরাম কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? নবীজী কোন মাযহাবের ছিলেন?

এসব অজ্ঞতাপ্রসূত প্রশ্ন শুনে রীতিমতো অবাক হতে হয়। যিনি প্রশ্ন করছেন অনেক সময় দেখা যায়, তিনি খুব ক্ষিপ্ত হয়ে এবং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশ্ন করছেন। মনে হয় যেন, তিনি কোনো মহা সত্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছেন এবং যারা মাযহাব মানে তাদের কোনো ভ্রান্তি ও বাতুলতা ধরে ফেলেছেন। বস্তুত, তিনি যে এতে চরম অজ্ঞতার শিকার হয়েছেন, সে খবরও তার নেই। তাই নিজের মূর্খতা ও ইতিহাস-অজ্ঞতাকে তিনি অনেক বড় জ্ঞান ও বাস্তব সত্য মনে করে বসে আছেন এবং অন্যকে ভ্রান্ত ও বাতিল ভাবছেন।

সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ড বর্তমানে সেখানে যথেষ্ট সমাদৃত। এর প্রধান মুফতী শায়েখ বিন বায রহ.ও তাদের কাছে বেশ প্রসিদ্ধ। এখন যদি কেউ মনে করে, শায়েখ বিন বাযের আগে সৌদি ভূখণ্ডেকোনো মুফতী ছিল না। তার এ ধারণা যেমন বাতিল বলার অপেক্ষা রাখে না, তেমনি আবু হানীফা রহ.-এর আগে কোনো মাযহাব বা ফকীহ ছিল না, তার একথাও বাতিল বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী রহ.-এর আগে যুগে যুগে হাদীসশাস্ত্রবিদ আলেম ছিলেন না, তার একথা যেমন অজ্ঞতাপ্রসূত, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি বলে, আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক রহ. প্রমুখের আগে যুগে যুগে ফতোয়াবিদ আলেম ছিলেন না, তার একথাও তেমনি অজ্ঞতাপ্রসূত। পুরো বিশ্বে যে কয়জন ইমামের কেরাত অনুসারে কেরাত পাঠ করা হয়, তাদের সবাই দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি বা পরের। তাই কেউ যদি বলে, তাদের আগে মুসলমানদের মাঝে কেরাত বিশেষজ্ঞ কোনো আলেম ছিলেন না বা কেউ কেরাত জানত না, তার এ কথা যেমন মুর্খতাপূর্ণ, ঠিক তেমনি যদি কেউ বলে, এই

চার ইমামের আগে মুসলমানদের মাঝে কোনো ফতোয়ার ইমাম ছিলেন না, তাও মূর্খতাপূর্ণ।

অনুরূপ কেউ যদি বলে, হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের আগে মুসলমানদের মাঝে হাদীসের চর্চা ছিল না এবং হাদীস জানত না। কেননা, (তার ধারণা) তখন কোনো কিতাব ছিল না। তার একথা যেমন মিথ্যা ও অবাস্তব, ঠিক তেমনি যদি কেউ বলে, চার ইমামের আগে মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে কোনো চর্চা হত না, কেউ কাউকে মাসআলা জিজ্ঞেস করত না, একথাও মিথ্যা এবং অবাস্তব।

আমরা মাযহাবের সূত্র ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দেখেছি, প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে মাযহাব ছিল। ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. সূচনা থেকে কোন পর্বে কার মাযহাব ছিল তাও উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এবার আসা যাক তাদের প্রশ্নটির জবাব প্রসঙ্গে। যার বিবরণ এই ইমাম আবু হানীফা রহ. যেহেতু মুজতাহিদ বা মুফতী ছিলেন, তাই তিনি নিজের ফতোয়া বা মাযহাব অনুসরণ করতেন। কিন্তু তার পিতা যেহেতু মুফতী নন, তাই তিনি তার সময়ের মুফতীদের মাযহাব মানতেন।

তাবেয়ীদের মধ্যে যারা মুফতী নন, তারা নিজেদের যুগের ও অঞ্চলের মুফতীদের মাযহাব মানতেন। সাহাবীদের মধ্যে যারা মুফতী নন, তারা নবীজীকে উপস্থিত পেলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, অন্যথায় মুফতী সাহাবীদের ফতোয়ার অনুসরণ করতেন।

প্রসিদ্ধ সাত কারী যদিও দ্বিতীয় শতাব্দীর, কিন্তু তাদের আগে যারা ছিলেন, তারা নিজেদের আঞ্চলের ইলমে কেরাতের ইমামদের পাঠ অনুসারে তেলাওয়াত করতেন। অনুরূপ তাবেয়ী থেকে সাহাবী, সাহাবী থেকে নবী পর্যন্ত।

হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের সংকলন যদিও তৃতীয় শতাব্দীর, কিন্তু তার আগে প্রত্যেক যুগে ও অঞ্চলেই হাদীসের চর্চা ছিল। এ পর্যায়ে যে ব্যক্তি হাদীসের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখত, অন্যরা তারই অনুসরণ করত। তাদের থেকে সাধারণ মানুষ হাদীস শিখত, তারা তাদের আগেকার হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের থেকে হাদীস শিখত, তারা তাদের আগেকারদের থেকেএভাবে তাবেয়ী থেকে সাহাবী, সাহাবী থেকে নবী।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহেবে ওহী অর্থাৎ তাঁর কাছে ওহী আসত। তিনি ওহীর অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর কুরআন নাযিল করেছেন। তাঁকে সুন্নাহ ও শরীয়ত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইজতেহাদকে ওহীর মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া ইলম ওহী। নবীজীর তালীম ও ফতোয়া পরবর্তী সাহাবী-তাবেয়ীসহ সকল ফকীহ ও মুজতাহিদ এবং তাদের মাযহাব ও ফতোয়ার উৎস।

সাহাবীদের মধ্যে যারা ফতোয়া দিতেন, তারা নিজেদের ফতোয়াই মানতেন। অন্য সাহাবী তাদের ফতোয়া মানতেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে হাদীসের কিতাব সংকলিত হয়ে প্রসিদ্ধ হওয়ার পর কেউ যদি বলে, নবীজী এগুলোর কোনটি পড়তেন এবং কোনটি মানতেন? একথা যেমন অজ্ঞতা ও বেয়াদবি, ঠিক তেমনি নবীজী চার মাযহাবের কোনটির অনুসারী ছিলেন?এমন কথা বলাও অজ্ঞতা এবং বড় ধরনের বেয়াদবি।

প্রসিদ্ধ সাত কারী হলেন দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর। এরপর থেকে সারা বিশ্বের মুসলমান কেউ আসেম রহ.-এর কেরাত অনুসারে কেরাত পড়ছে, যেমন বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান, আবার কেউ নাফে' রহ.-এর কেরাত পড়ছে। কেউ অন্যদের। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, নবীজী এই সাতকারীর কার তেলাওয়াত অনুসরণ করতেন? এটা যেমন নির্বুদ্ধিতা, ঠিক তেমনি চার মাযহাবের ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন করা নির্বুদ্ধিতা।

কোন হাদীস সহীহ, কোন হাদীস যয়ীফ, কোন রাবী ছিকা এবং কোন রাবী দুর্বল, এক্ষেত্রে আমরা ইমাম বুখারী রহ., ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ., আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসের অনুসরণ করি। আরবী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আমরা সিবওয়াইহ রহ., আখফাশ রহ., খলীল রহ. প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ ইমামকে মানি। আরবী লুগাতের ক্ষেত্রে আমরা জাওহারী রহ., আছমায়ী রহ. এবং এ বিষয়ে পণ্ডিত অন্যান্য ইমামকে অনুসরণ করি। এরা সাহাবী-তাবেয়ীদের অনেক পরের।

হাদীস শাস্ত্রে সাহাবায়ে কেরাম ইমাম বুখারী বা মুহাদ্দিসগণকে মানতেন কি না? আরবী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তারা সিবওয়াইহ বা আখফাশকে মানতেন কি না? এধরনের প্রশ্নের অসারতা সবাই বুঝি বা জানি, তাহলে মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুফতীদের কাছে গেলে কেন প্রশ্ন হবে, সাহাবীগণ আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ীকে মানতেন কি না? যদি এখানে কেউ এ ধরনের প্রশ্ন করে, তাহলে অন্য সব শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন করা হবে না কেন?

আসলে মূল কথা হল হাদীস, ব্যাকরণ, কেরাত, লুগাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা বাস্তবতা বুঝি, কিন্তু মাযহাবের ক্ষেত্রে তা বুঝতে চাই না অথবা অজ্ঞতার দরুন মাযহাবকে এসব থেকে ভিন্ন মনে করি। অথচ এসবের সূত্র ও ধরন-প্রকৃতি একই।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত ও হুকুম-আহকাম পালনের জন্য। তাই মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান পরিবেষ্টিত। এখন যদি কেউ এসব বিধিবিধান না জানে এবং সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে গবেষণা করে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক যেসব যোগ্যতার শর্তারোপ করা হয়েছে সেগুলো তার মধ্যে না থাকে, তাহলে জানা কথা যে, তাকে একজন শরীয়তের ফকীহ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। এটা যেমন স্বভাবজাত ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয়, তেমনি আল্লাহ তাআলারও নির্দেশ। কুরআন হাদীসের অনেক জায়গায় এ নির্রেদশের কথা এসেছে, তাই আল্লাহর বিধান মানা যেমন কর্তব্য, তেমনি বিধান না জানলে, নিজের মধ্যে সে যোগ্যতা না থাকলে দ্বীনের ফকীহ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রত্যাবর্তন ও শরণাপন্ন হওয়াও কর্তব্য। এক্ষেত্রে বিধান লঙ্ঘন করে কেউ যদি নিজে নিজেই গবেষণা চালায় এবং সে অনুসারে আমল করে অথচ তার মধ্যে কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি হুকুম আহরণের যোগ্যতা নেই, তাহলে সে উক্ত বিধান লঙ্ঘনকারী। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়ভাবেও সে অপরাধী। অনুরূপ সে যদি দ্বীনের ফকীহ ও প্রাজ্ঞের কাছে না গিয়ে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ কারো কাছে যায়, তাতেও ওই বিধানের লঙ্ঘন করা হবে এবং একই শ্রেণির অপরাধী।

মাযহাবের হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনার পর সঙ্গত মনে হচ্ছে তাকলীদ সম্পর্কেও আলোচনা করার। কেননা, তাকলীদ বিষয়টিও অনেকের কাছে অস্পষ্ট। তাই তাকলীদ সম্পর্কেও শোনা যায় অনেক অবান্তর ও অজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্ন। কেউ কেউ তো একে সরাসরি শিরকই বলেন। তাই এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি। আশা করি আমরা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا

‘পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকাও তো আমিই বণ্টন করেছি এবং আমিই

তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে তারা তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে।’ সূরা যুখরুফ ৩২

আল্লাহ তাআলা পার্থিব উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাব-সামগ্রী সবাইকে সমানভাবে দেননি। একজনকে যে পরিমাণ অর্থ-কড়ি দিয়েছেন অপরজনকে ওই পরিমাণ দেননি। কাউকে আবার অর্থ-বৈভবে ওই পরিমাণ সম্পদশালী করেননি, কিন্তু শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট দিয়েছেন।

যাকে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন তাকে আবার যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাব নিজে তৈরি করার শক্তি-সামর্থ্য দেননি। তাই তাকে এসব ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। যেমন আমরা কৃষি সামগ্রীর জন্য কৃষকের শরণাপন্ন হই। কৃষক আবার অর্থের জন্য অর্থের মালিকের শরণাপন্ন হয়। চিকিৎসার জন্য আমরা চিকিৎসকের কাছে যাই,

চিকিৎসক আবার অর্থের জন্য রোগীর মুখাপেক্ষী হয়। আল্লাহ তাআলা এভাবে একজনকে অন্যজনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। একজনকে অন্যজনের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন।

এ তো গেল পার্থিব উপায়-উপকরণ ও আসবাব-সামগ্রীর কথা। ঠিক বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা অনুরূপ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা সবাইকে সমান করেননি। সবাইকে বিদ্যাবুদ্ধি সমান দান করেননি। কাউকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেছেন অন্যজনকে ওই পরিমাণ জ্ঞান দান করেননি। একজনকে এক ধরনের জ্ঞান দান করেছেন তো অন্যজনকে ভিন্ন ধরনের জ্ঞান দান করেছেন। এভাবে বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও পরস্পরকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, পরস্পরকে মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। সবাইকে যদি সমান স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হত তাহলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী থাকত না; বরং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তৈরি হত। একজন অপরজনের ওপর চড়াও হত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧

অর্থাৎ মানুষ সীমালংঘন করে। কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। সূরা আলাক ৬-৭

এটি একটি সাধারণ নিয়ম, মানুষের যখন কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় আর তা যদি তার কাছে না থাকে, তাহলে তা হাসিলের জন্য সে অন্যের ধারস্থ হয় এবং কোনোভাবে তা অর্জন করে সে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে। তাই মানুষ চিকিৎসকের কাছে যায় চিকিৎসা নেওয়ার জন্য; ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যায় ইঞ্জিনিয়ারিংসেবা নেওয়ার জন্য; শিক্ষকের কাছে যায়, ব্যবসায়ীর কাছে যায় ইত্যাদি। এভাবে সে অন্যের শরণাপন্ন হয় এবং তার স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি পূরণ করে থাকে। এটি মানুষের একটি সহজাত নিয়ম। আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবে এটি প্রোথিত করে দিয়েছেন। তাই মানব ইতিহাসের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত সকল মানুষ জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভূখ- নির্বিশেষে এই

সহজাত ও স্বভাবজাত নিয়মেই পরিচালিত হয়ে এসেছে।

মানুষের জন্য ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তাই সব মানুষ কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাসী। এমনকি যে ব্যক্তি কোনো ধর্ম স্বীকার করে না বলে দাবি করে, সেও কোনো না কোনো দর্শন ও ধর্মে বিশ্বাস করে। যদিও সঠিক ধর্ম একমাত্র ইসলাম। ধর্ম মানুষের কাছে জাগতিক জীবন থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জাগতিক প্রয়োজন পূরণে সে যেমন অন্যের কাছে যায়, তেমনি ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণে অন্যের শরণাপন্ন হওয়ার সে আরো বেশি প্রয়োজন অনুভব করে। তাই জাগতিক প্রয়োজনের মতো ধর্মীয় প্রয়োজনেও মানুষ তার সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এই নিয়মেই পরিচালিত হয়ে এসেছে। সুতরাং পৃথিবীর মানুষ সে যেকোনো ধর্ম ও দর্শনেই বিশ্বাসী হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হলে সে তার চেয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গিয়ে সমাধান লাভ করে।

আর এই যে আমি চিকিৎসকের কাছে গেলাম এবং তার চিকিৎসা অনুসরণ করলাম; প্রকৌশলীর কাছে গেলাম, তার দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করলাম; আইনজ্ঞের কাছে গেলাম, তার কথা মানলাম; ব্যবসা-বাণিজ্য বা এ জাতীয় কোনো বিষয়ে পরামর্শের জন্য বড়দের কাছে গেলাম এবং তাদের পথ ও মত অনুযায়ী চললাম; ঠিক তেমনি এ সবকিছু থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী বিষয়ে মুফতী সাহেবের কাছে গেলাম এবং তার কাছ থেকে সমাধান জেনে আমল করলামএটিই তাকলীদ, যার অর্থ অনুসরণ-অনুকরণ এবং এসবই তাকলীদ।

এখন ভাবা দরকার, যখন কোনো ব্যক্তি তার দ্বীনী জিজ্ঞাসা নিয়ে চার ইমামের কারো কাছে গেল বা তাদের সংকলিত ফিক্হ-ফতোয়ার (ফিকহী মাযহাবের) বিশেষজ্ঞ আলেমের (মুফতীর) শরণাপন্ন হল, এতে তো সে সহজাত নিয়মই পালন করল। যা শুধু দ্বীনী নয়, বরং জাগতিক ক্ষেত্রেও পালন করে থাকে। আর এ ছাড়া তার কোনো গতিও নেই।

সে যখন চিকিৎসা জানে না, তখন তাকে চিকিৎসকের কাছে যেতেই হবে। ব্যবসা বোঝার জন্য দক্ষ ব্যবসায়ী থেকে কলাকৌশল রপ্ত করতেই হবে। ভাষাবিদ্যা জানা নেই, ভাষাবিদের কাছে যেতেই হবে।

হাদীসের সহীহ-যয়ীফ জানা নেই, তাই মুহাদ্দিস ও রিজাল শাস্ত্রবিদের কাছে যেতেই হবে। ইলমুল কেরাত সম্পর্কে যখন জানা নেই, কারীদের শরণাপন্ন হতেই হবে। তেমনিভাবে যখন ফতোয়া ও সমাধান জানা নেই, তখন ফতোয়াবিদ ও ফকীহের কাছে যেতেই হবে। এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই।

যার জানা নেই সে সহজাত নিয়মটিই পালন করেছে, যা সবাই তাদের জাগতিক বিষয় হোক বা ধর্মীয়, সকল ক্ষেত্রে করে থাকে এবং যা না করে তাদের কোনো উপায়ও নেই। এতে অসুবিধা কোথায়?

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, তাকলীদের দলিল কী? তার এই প্রশ্নের অর্থ দাঁড়ায়, পৃথিবীর মানুষ সকল ক্ষেত্রে জাগতিক হোক বা ধর্মীয়, প্রয়োজনে যে অন্যের কথা মানে ও অনুসরণ করে, তা কোন দলিলের ওপর ভিত্তি করে এই তাকলীদ করে থাকে?!

অথচ বিষয়টি এমন নয়, বরং মানুষ সকল বিষয়ে জাগতিক হোক বা ধর্মীয়, সে যে অন্যের অনুসরণ করে তা সহজাত নিয়মের ভিত্তিতেই করে, যা আল্লাহ তাআলা মানবের সত্তায় প্রোথিত করে দিয়েছেন। আর এটা সবার কাছে স্বতঃসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট বিষয়, সহজাত বিষয়ে কোনো দলিল লাগে না।

ক্ষুধা লেগেছে তাই খেতে হবে, পিপাসা পেয়েছে তাই পান করতে হবে, বস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছে বস্ত্র কিনতে হবে, অসুখ হয়েছে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে, কোনো বিদ্যা বা ভাষা শেখার দরকার হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞদের কাছে যেতে হবে। কোনো বিষয় জানি না, তা জানতে হলে যে জানে তার কাছে যেতে হবে। এগুলোতে দলিলের দরকার হয় না এবং এগুলো দলিলের বিষয়ও নয়। তাই মুসলমান কাফের এমন কি যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয় তারাও এসব করে এবং মানে। ঠিক তেমনি মাসআলা-মাসায়েলের জন্য মাসআলাবিদ ও ফকীহের কাছে যেতে হবে। এটিও দলিলের অপেক্ষা রাখে না। বরং এটি দলিলেরও বিষয় নয়। এও উপরিউক্তগুলোর মতো একটি। এও একটি সহজাত নিয়ম। এর কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই।

চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজ্ঞ প্রমুখের তাকলীদ বা অনুসরণকে সহজাত মনে করি, মাসআলা-মাসায়েলে কোনো মুফতীর তাকলীদ বা অনুসরণকে সহজাত মনে করি না, বরং তা দালিলিক বিষয় মনে করি। অথচ উভয়টি একই গোত্রীয়। নিজ প্রয়োজনে অন্যের অনুসরণ করা। সেখানে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছে আর এখানে একই নিয়মে ফতোয়াবিদের কাছে যাচ্ছে। আর এই ভিন্ন মনে করার কারণেই সব ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং কেউ কেউ সন্দেহে পড়ে যায়, আসলেই তো, তাকলীদের দলিল কী?

কিন্তু তিনি কি একটু খেয়াল করেছেন, তার জাগতিক জীবনের হাজারো ক্ষেত্রে তিনি তাকলীদ করে চলেছেন, যার কোনো ক্ষেত্রেই তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি।

কিছু বিষয় আছে শরয়ী। অর্থাৎ যা শরীয়ত ছাড়া জানা বা বোঝা যায় না। যেমন, নামায কত ওয়াক্ত, কোন নামায কত রাকাত, এক রাকাতে রুকু কয়টি, সেজদা কয়টি, রোযা কয় মাস ইত্যাদি। এগুলো শরীয়তের বিবরণ ছাড়া জানা বা বোঝা যায় না। এসবের জন্য দলিলের প্রয়োজন হয়। আর কিছু বিষয় আছে সহজাত, যা বুঝতে দলিলের প্রয়োজন হয় না। যারা দলিল জানে না বা বুঝে না তারাও তা বুঝে। এসবের জন্য কুরআন হাদীসের দলিল লাগে না। এগুলো দালিলিক বিষয় না। এগুলোতে দলিল চাওয়া অজ্ঞতা। যেমন ক্ষুধা লাগলে খাওয়া, পিপাসা লাগলে পানি পান করা, অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ইত্যাদি। এ কাজগুলো করতে গেলে শরীয়ত কর্তৃক কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। এগুলোর বৈধতা ও আবশ্যকীয়তা সহজাতভাবেই বোঝা যায়। আমাদের আলোচিত বিষয় তাকলীদও এর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু তাকলীদকে আমরা সহজাত থেকে ভিন্ন মনে করে দালিলিক মনে করে ফেলেছি। এটাই আমাদের স্খলন ও বিচ্যুতি। এরপর আমরা এর দলিল-প্রমাণ সংগ্রহ এবং তা খ-নে মত্ত হয়ে যাই।

অথচ এটা দালিলিক বিষয় হলে হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আলী ইবনুল মাদীনী তথা হাদীস বিশারদদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কথা মানা, তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাস্সিরীনকে মানা, কেরাতের ক্ষেত্রে কারীদের শরণাপন্ন হওয়া, নাহু-সরফের ক্ষেত্রে নাহু-সরফবিদদের অনুসরণ করা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের তাকলীদ করা ইত্যাদি সবকিছুই দালিলিক বিষয়ে পরিণত হবে। তখন এসবের প্রতিটির জন্য কুরআন হাদীসের দলিল লাগবে নতুবা এগুলোর কোনোটিই করা যাবে না। অথচ এসবের মধ্যে দলিল ব্যবহার করা তো দূরের কথা, দলিল যে লাগবে তা কারোর কল্পনায়ও

আসে না। বরং কেউ যদি এসব ক্ষেত্রে দলিল তালাশ করে, তাহলে সে মানুষের কাছে হাসির পাত্র হয়।

কী বৈচিত্রময় যুগ! জাগতিক কোনো ক্ষেত্রেই প্রাজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে দলিলের প্রয়োজন হয় না, বরং তা কারো কল্পনায়ও আসে না; কিন্তু মাসআলা ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে যেতে দলিল লাগবেই লাগবে!

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার তা হল, কারো ধারণা হতে পারে, যেহেতু তাকলীদ সহজাত বিষয়, তাহলে মনে হয় এটি শরীয়তের কোনো বিষয় নয় এবং তা পালনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিষয়টি এমন নয়, বরং কিছু সহজাত বিষয় এমন আছে, যা পালন করা অপরিহার্য। মানুষমাত্রই মানতে হয়। তাকলীদ এগুলোর অন্যতম। জাগতিক ক্ষেত্রে তাকলীদ না করলে যেমন দুনিয়াবি জীবন বিশৃংখল ও ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনিভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞের তাকলীদ না করলে তার ধর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। চিকিৎসাজ্ঞানশূন্য রোগী চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে নিজেই যদি চিকিৎসা শুরু করে, তাহলে তার জাগতিক জীবন বিপন্ন হওয়া নিশ্চিত। ঠিক তেমনি ফতোয়াজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি কোনো প্রাজ্ঞ মুফতীর কাছে না গিয়ে যদি নিজেই সমাধান করে, তাহলে তার ধর্মীয় জীবনও বিপন্ন হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু কথা হল, জাগতিক বিপন্ন হওয়া তো আমরা সহজেই বুঝি, ধর্মীয় জীবনের বিপন্নতা আমরা বুঝতে পারি না কেন?!

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর নবুওয়তের জানান দিলেন, তখন মক্কার লোকেরা আপত্তি তুলল, মানুষ কীভাবে নবী হয়? নবী তো ফেরেশতা হবেন। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন-

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

‘(হে নবী) আপনার আগে আমি যাদের নবী হিসেবে পাঠিয়েছি, তারা পুরুষই (মানুষ) ছিলেন, তাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম। (হে আপত্তিকারীরা) তোমরা যদি না জান, তাহলে যারা জানে তাদের জিজ্ঞেস কর।’ সূরা নাহ্ল ৪৩

আল্লাহ তাআলা এখানে মুশরিকদেরকে বিজ্ঞজনদের জিজ্ঞেস করার আদেশ দিয়েছেন। এটা এজন্য যে, এই আদেশ অর্থাৎ কোনো বিষয় জানা না থাকলে, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করা শুধু ইসলামের বিষয় নয়, এটা মানুষের সহজাত বিষয়। ধর্ম-বর্ণ ও স্থান-কাল নির্বিশেষে সবাই এই নিয়ম অনুযায়ীই চলে। এর বিপরীতে মানুষ চলতে পারে না। আর সে সহজাত নিয়ম উপেক্ষা করা যায় না বলে মুশরিকরাও এই আদেশের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। আল্লাহ তাআলা এই সহজাত নীতিটিকে সমর্থন করেছেন এবং এ নীতি দিয়েই তাদের খণ্ডন করেছেন। তাই এটা ইসলামেরও রীতি ও অংশ। তাই সমগ্র উলামায়ে কেরাম এ আয়াত থেকে তাকলীদের অপরিহার্যতা ও আবশ্যকীয়তার বিধান উদ্ঘাটন করেছেন। অথচ আয়াতে জিজ্ঞেস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে মুশরিকদেরকে।

আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. বলেন-

وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تَقْلِيدُ عُلَمَائِهَا وَأَنَّهُمُ الْمُرَادُونَ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: >فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ< (النحل:৪৩) وَأَجْمَعُوْا عَلٰى أَنَّ الأَعْمٰى لَا بُدَّ لَهٗ مِنْ تَقْلِيْدِ غَيْرِهٖ مِمَّنْ يَثِقُ بِمَيْزِهٖ بِالْقِبْلَةِ إِذَا أُشْكِلَتْ عَلَيْهِ، فَكَذٰلِكَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهٗ وَلَا بَصَرَ بِمَعْنًى مَا يَدِيْنُ بِهٖ لَا بُدَّ لَهٗ مِنْ تَقْلِيْدِ عَالِمِهٖ، وَكَذٰلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَجُوْزُ لَهَا الْفُتْيَا، وَذٰلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ

لِجَهْلِهَا بِالْمَعَانِي الَّتِيْ مِنْهَا يَجُوْزُ التَّحْلِيْلُ وَالتَّحْرِيْمُ.

‘এ ব্যাপারে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই যে, কুরআন হাদীস থেকে যে নিজে নিজে বিধান উদ্ঘাটন করতে পারে না, তার জন্য উলামায়ে কেরামের তাকলীদ করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘তোমরা না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর’এর দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। উলামায়ে কেরামের সবাই একমত, অন্ধ ব্যক্তি যখন কেবলা

কোন্ দিকে তা বুঝতে পারে না, তখন তার জন্য অন্যের ‘তাকলীদ’ তথা অনুসরণ করা জরুরি। ঠিক তেমনিভাবে দ্বীন সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই, তার জন্য জরুরি হল আলেমের অনুসরণ করা।

তেমনিভাবে উলামায়ে কেরামের সবাই একমত, এ ধরনের ব্যক্তির ফতোয়া দেওয়া না-জায়েয। যেহেতু কোনো বিষয় কীভাবে হারাম হয় এবং কীভাবে হালাল হয় সে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই।’ জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া-ফাযলিহী ৩৪২

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে কুরআন হাদীস থেকে ফতোয়া বের করার যোগ্যতা রাখে না, তার জন্য কর্তব্য ও ফরয, যে এ বিষয়ে জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ তার কাছে ফতোয়া জানা এবং তার কথা মানা। এটা যেমন অলংঘনীয় সহজাত নিয়ম, তেমনি ইসলামের অকাট্য বিধানও বটে। তা না হলে কোনো যুগে কোনো ভূখণ্ডে ইসলাম নিরাপদ থাকবে না, যে যার মতো ফতোয়া দিয়ে জীবন যেমন বিপন্ন করবে, তেমনি ইসলামকেও বিপন্ন করবে।

তাকলীদ সম্পর্কে এমন উপলব্ধি সব যুগের উলামায়ে কেরামেরই ছিল। আমাদের জানা নেই, পৃথিবীর কোনো আলেম এই তাকলীদকে অস্বীকার করেছে বা করতে পারে। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বহু বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাবে। কিন্তু বিষয়টি স্বীকৃত ও প্রমাণিত বলে সেসব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করছি না। উপরিউক্ত আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ.-এর বক্তব্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

আমরা যারা আজ আরব দেশের কোনো কোনো আলেমের কিছু বক্তব্য শুনে প্রভাবিত হয়ে ‘তাকলীদ’কে নিন্দা করি বা আরো খারাপ কিছু মনে করি, স্বয়ং সে দেশের আলেম-উলামাও এই তাকলীদের অপরিহার্যতাকে মানেন, বরং সবাইকে তাকলীদ করতে নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাদের দেশের সাধারণ মুসলমান যদি তাকলীদ না করে, তাহলে তাদের দেশেও ইসলাম বিপন্ন হয়ে যাবে। তাই সঙ্গত মনে হচ্ছে, এখানে তাদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরি।

সৌদি আরবের বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ আলেম, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ. বলেন-

فَالْعَامِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ عُلَمَاءَ بَلَدِهِ الَّذِيْنَ يَثِقُ بِهِمْ، وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِيٍّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَقَالَ: اَلْعَامَّةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَلِّدَ عُلَمَاءَ مِنْ خَارِجِ بَلَدِهِمْ، لِأَنَّ هٰذَا يُؤَدِّى الْفَوْضٰى وَالنِّزَاعَ، لِأَنَّ فَرْضَكَ أَنْتَ هُوَ التَّقْلِيْدُ وَأَحَقُّ مَنْ تُقَلِّدُ عُلَمَاءُكَ، وَلَوْ قَلَّدْتَّ مَنْ كَانَ مِنْ خَارِجِ بَلَدِكَ أَدّٰى ذٰلِكَ إِلَى الْفَوْضٰى فِيْ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ.

অর্থাৎ কুরআন হাদীস থেকে বিধান বের করার জন্য যত প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন যাদের কাছে সেগুলো নেই, তাদের জন্য আবশ্যক হল নিজ দেশের নির্ভরযোগ্য আলেমগণের তাকলীদ করা। বিষয়টি আমাদের উস্তায শায়েখ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের মানুষের জন্য নিজ দেশের আলেম ছাড়া অন্য দেশের আলেমের তাকলীদ করার কোনো অবকাশ নেই। এর অবকাশ দেওয়া হলে সমাজ দ্বন্দ্ব ও লাগামহীনতায় নিপতিত হবে। (কারণ, তখন একই দেশের কেউ নিজ দেশের আলেমের অনুসরণ করবে, কেউ আরেক দেশের, আবার কেউ তৃতীয় দেশের, এভাবে নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হবে। আবার প্রত্যেকে প্রবৃত্তির অনুসরণে যখন যার ফতোয়ায় প্রবৃত্তির কামনা পূরণের সুযোগ পাওয়া যাবে তখন তার কথা মানবে। এভাবে সমাজ লাগামহীন হয়ে যাবে।) তাই প্রত্যেকের কর্তব্য, নিজের দেশের আলেমদের অনুসরণ করা। লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ (শামেলা)

শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ.-এর উক্ত বক্তব্যটি নিয়ে আমরা একটু ভাবি। তিনি এবং তাঁর শায়েখ সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ তো আবশ্যক মনে করেনই, সঙ্গে সঙ্গে তারা এও বলেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য তার দেশের আলেমদেরই অনুসরণ করতে হবে, দেশের বাইরের কারো নয়।

সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় আলেম মসজিদে নববীর প্রসিদ্ধ ওয়ায়েয শায়েখ আবু বকর জাবের জাযায়েরী তাঁর তাফসীরগ্রন্থে সূরা আম্বিয়ার ৭ নম্বর আয়াত

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧

এর ব্যাখ্যায় লেখেন-

وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَقْلِيدِ الْعَامَّةِ الْعُلَمَاءَ، إِذْ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا يُفْتُونَهُمْ بِهِ وَيُعَلِّمُونَهُمْ بِهِ.

‘এই আয়াত প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষের জন্য উলামায়ে কেরামের তাকলীদ করা ওয়াজিব ও আবশ্যক। তারা যে ফতোয়া দেবেন এবং তারা যা শেখাবেন, তা মানা সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াজিব। কেননা, আয়াতে ‘আহলুয্ যিকর’ দ্বারা আলেমগণই উদ্দেশ্য।’ আইসারুত তাফাসীর ৭৭০

এই বিষয়ে আরবের বহু আলেমের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাবে। কেননা, এ ধরনের ‘তাকলীদ’ সত্য ও বাস্তব। আর তা কোনো আলেমের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বাকি, আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য সামনে শুধু একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

বক্তব্যটি হল সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় ফতোয়া বিভাগ ও কেন্দ্রীয় মুফতী বোর্ডের ফতোয়া। তাদের প্রধান হলেন সৌদি আরবের প্রধান মুফতী, তাদের সবারই মান্যবর বরেণ্য শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.। ফতোয়াটি তিনি এক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে প্রদান করেন।

জিজ্ঞাসাটি ছিল তাকে কোনো শিক্ষক বলেছেন, একটি আমল যেমন, নামায বা রোযা ইত্যাদিতে চার মাযহাবকে একত্র করা যাবে না। অর্থাৎ একটি আমল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক মাযহাবের নিয়মেই করতে হবে। এক অংশ এক মাযহাব অনুযায়ী, আরেক অংশ আরেক মাযহাব অনুযায়ী এমনটি করা যাবে না। প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসা ছিল, শিক্ষকের একথাটি ঠিক কি না?

এর জবাবে বোর্ড লেখে-

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ مُطَالَبًا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ فِي عَمَلِهِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ بِنَفْسِهِ مِنْ أَدِلَّتِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ قَلَّدَ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: >فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ<، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: >فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<.

‘কোনো মুসলমান তার কাজে-কর্মে ও আমলে চার মাযহাব একত্র করবে—এমন কোনো নির্দেশ তার প্রতি নেই। তার থেকে এমন কিছু চাওয়াও হয়নি। বরং সে যদি কুরআন হাদীস থেকে নিজে নিজে বিধান উদ্ভাবন করতে পারে, তাহলে তার জন্য আবশ্যক, সে নিজে উদ্ভাবন করে সে অনুযায়ী চলবে। আর যদি এমন উদ্ঘাটনে সক্ষম না হয়, তাহলে সে মুসলমানদের অনুসরণীয় ইমামগণ থেকে যেকোনো একজনের তাকলীদ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন (তরজমা) তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। এবং আরো বলেন (তরজমা) সুতরাং আলেমদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।’ ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দায়িমা ৫/৪৪

আরেকজন প্রশ্ন করেছেন, (নবুওয়তের মতো) ইজতেহাদের ধারাও কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

এর উত্তরে বোর্ড লেখে ইজতেহাদের দ্বার বন্ধ হয়নি। বরং তা এখনো খোলা। তবে তাদের জন্য, যারা কুরআন, হাদীস, সাহাবী ও পরবর্তী আলেমগণের বাণী ও উক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও গভীর দৃষ্টি রাখেন।

এরপর লেখে-

وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذٰلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ.

'আর যে ব্যক্তি এ ধরনের নয়, তার জন্য আবশ্যক, সে প্রাজ্ঞ আলেমগণের অনুসরণ করবে।' প্রাগুক্ত ৫/২৫

এ প্রসঙ্গে বোর্ড কর্তৃক যতগুলো ফতোয়া পাওয়া যায়, মোটামুটি সবগুলোতে একই কথা বলা হয়েছে। তাই নমুনাস্বরূপ দুটি উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করলাম।

মোটকথা, জাগতিক সকল কিছুর মতো ধর্মীয় ক্ষেত্রেও কোনো বিষয়ে না জানা থাকলে, যে জানে তার কাছে জিজ্ঞেস করা। এটিই 'তাকলীদ'। এটি স্বতঃসিদ্ধ ও সহজাত বিষয়। পৃথিবীর কোনো বিবেকবান মানুষ তা অস্বীকার করতে পারে না। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই এ নিয়ম চলে এসেছে। আল্লাহ তাআলাই এ নিয়মের সৃষ্টিকর্তা। ইসলামেও এ বিধান অপরিহার্য।

মাসআলাগত কোনো অবস্থা সামনে এলে সাধারণ মানুষকে আলেমদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি, কেউ হয়ত কুরআন সুন্নাহর এমন বিজ্ঞ আলেমকে জিজ্ঞেস করে, যিনি চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসারী। আর কেউ হয়ত এমন কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করে যিনি কোনো মাযহাবের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন না। এ সবই 'তাকলীদ'। এর বিপরীতে তাদেরও কোনো উপায় নেই।

এখানে আরেকটি প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা সঙ্গত মনে হচ্ছে। যদিও এটি এমন কোনো বিষয় নয়, যা আলোচনা করে বা দলিল-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণসিদ্ধ করা দরকার। কিন্তু ইতিহাস জানা না থাকার কারণে বিষয়টি অনেকের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে। আর তা এই যে, অনেকের ধারণা তাকলীদ চার ইমামের পরের যুগের সৃষ্টি। কেউ কেউ তো বলেই ফেলে, তাকলীদ পরবর্তী যুগের সৃষ্টি।

উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তাকলীদ অর্থ কোনো বিষয়ে মাসআলা জানা বা ফতোয়া জানা দরকার, তাই মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে ফতোয়া জানা এবং তা মানা। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এ ধারা কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটি একটি সহজ কথা। এ ধারা সর্বযুগে সব অঞ্চলেই ছিল। আরো সহজে বলা যায়, ফতোয়া যখন থেকে তাকলীদও তখন থেকে। কেননা, ফতোয়া তো দেওয়াই হয় তাকলীদ করার জন্য। যিনি ফতোয়া জানতে এসেছেন, তিনি তা মানার জন্য এবং অনুসরণের জন্য এসেছেন। তাই সহজ কথা, ফতোয়া যখন থেকে তাকলীদও তখন থেকে। ফতোয়া যখন থেকে মাযহাবও তখন থেকে।

ইতিপূর্বে আমরা ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ও ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর বক্তব্য থেকে জানতে পেরেছি, কোন যুগে কোথায় কোন মাযহাব ছিল। সে আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার যে, মাযহাব পরবর্তী যুগের আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়। বরং তা আগে থেকেই চলে এসেছে। সুতরাং তাকলীদও আগে থেকেই চলে এসেছে। চার ইমামের পরবর্তী যুগের সৃষ্টি নয়। এসব ইতিহাসের জন্য কোনো দলিল-প্রমাণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। তারপরও আরব বিশ্বের সমকালীন একজন আলেমের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ.-এর পরিচিতি আমরা আগেই পেশ করেছি। তিনি বলেন-

وَالتَّقْلِيْدُ فِي الْوَاقِعِ حَاصِلٌ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. وَلَاشَكَّ أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِيْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَإِلٰى عَهْدِنَا هٰذَا مَنْ لَايَسْتَطِيْعُ الْوُصُوْلَ إِلَى الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ لِجَهْلِهِ وَقُصُوْرِهِ، وَوَظِيْفَةُ هٰذَا أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ، وَسُؤَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ الأَخْذَ بِمَا قَالُوْا، وَالأَخْذُ بِمَا قَالُوْا هُوَ التَّقْلِيْدُ.

'বাস্তবে তাকলীদ সাহাবা যুগ থেকেই চলে এসেছে। কেননা, সাহাবীদের যুগ থেকে আমাদের পর্যন্ত প্রত্যেক সময়েই এমন মানুষ ছিল, যারা নিজে নিজে কুরআন হাদীস গবেষণা করে বিধান জানতে সক্ষম নয়, নিজের অজ্ঞতা ও যোগ্যতার অভাবের কারণে। আর তাদের কর্তব্য হল আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করা। আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করা মানে তাদের কথা মানা। আর এটিই হল তাকলীদ।'

ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব ২/২২০

তাওহীদ ও শিরক বিষয়ে শরীয়তের উসূল ও বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে চরম বাড়াবাড়ির শিকার কেউ কেউ বলে থাকে, তাকলীদ করা শিরক।

একজন মুসলমান সামান্যতম ঈমানের অধিকারী হলেও শিরক শব্দটি তার কাছে আঁতকে ওঠার মতো বিষয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার কাছে শিরকের চেয়ে মারাত্মক ঘৃণিত কোনো পাপ নেই। তাই আল্লাহ তাআলা সব ধরনের পাপ ক্ষমা করলেও শিরক ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

‘নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ ক্ষমা করে দেন, যার জন্য চান। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করল, সে আল্লাহর প্রতি মারাত্মক অপবাদ আরোপ করল।’ সূরা নিসা ৪৮

নবীগণ আল্লাহ তাআলার কত নৈকট্যশীল তা সবার জানা। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকেও শিরকের বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলেছেন-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

‘বাস্তব কথা হল, তোমাকে এবং তোমার আগেকার নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছিল, যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।’ সূরা যুমার ৬৫

শিরক একজন মুসলমানের কাছে সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয়। তাই একজন মুসলমান তার সব কিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও শিরক থেকে দূরে থাকবে, এটিই স্বাভাবিক বিষয়।

শিরক হল আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাঁর সত্তা এবং যেসব গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, সেগুলোতে কাউকে শরিক করা। এমনিভাবে যেসব বিষয় আল্লাহর হক, সেগুলোর কোনোটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা বা সম্পাদন করা। যেমন ইবাদত একমাত্র আল্লাহর হক। শরীয়ত প্রদান একমাত্র আল্লাহর হক। তাই আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে শরীয়ত প্রদানের অধিকারী মনে করা শিরক।

এবার আমরা দেখব, যারা তাকলীদ করে তারা এ ক্ষেত্রে কী করে। কুরআন হাদীস থেকে নিজে বিধান আহরণের জন্য যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন তা না থাকায় কোনো মাসআলার জন্য এ ধরনের যোগ্য কোনো মুফতীর কাছে গিয়ে সমস্যাটি বললে, মুফতী সাহেব কুরআন হাদীস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা যা দরকার সবকিছু দেখে ভেবে-চিন্তে গবেষণা করে সমস্যাটির সমাধান বের করে দেন আর সে ব্যক্তি তা অনুযায়ী চলে। তাকলীদকারী ব্যক্তি সর্বসাকুল্যে যা করে তা এ-ই। তো এতে শিরকের কি হল?

সে তো মুফতীর কাছে যাচ্ছেই মুজতাহিদ ইমামের মাযহাবে কুরআন সুন্নাহ এবং কুরআন সুন্নাহয় পেশকৃত আল্লাহর দেওয়া ইসলামী শরীয়তের আলোকে এর কী সমাধান পেশ করা হয়েছে তা জানার জন্য। সে মুফতীকে এবং ইমামকে শরীয়তদাতা মনে করে না কখনো; বরং ইমাম হলেন শরীয়তের মুজতাহিদ এবং মুফতী হলেন শরীয়তের আলেম। যখন সে মুফতীর শরণাপন্ন হচ্ছেই আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়তে তার সমস্যার কী সমাধান রয়েছে তা জানার জন্য, তাহলে এতে শিরকের কী হল? এ তো বরং সকল বেদআত ও শিরক থেকে বের হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর শরীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন।

আর এমন করা তার জন্য শরীয়ত মতে আবশ্যক এবং এ ছাড়া তার কোনো উপায়ও নেই। আচ্ছা, কোনো বিষয় জানা না থাকলে সে বিষয়ের শাস্ত্রজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া কি দোষের বিষয় বা শিরক?

আর এমন করা তার জন্য শরীয়ত মতে আবশ্যক এবং এ ছাড়া তার কোনো উপায়ও নেই। আচ্ছা, কোনো বিষয় জানা না থাকলে সে বিষয়ের শাস্ত্রজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া কি দোষের বিষয় বা শিরক?

যদি ফতোয়া-অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কথা মানা শিরক হয়, তাহলে অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কথা মানা শিরক বা দোষের হবে না কেন? হাদীসটি সহীহ না-যয়ীফ, এ ক্ষেত্রে আমরা ইমাম বুখারীর শরণাপন্ন হয়ে তার কথা মানি। বর্ণনাকারী 'ছিকা' না 'দুর্বল' এ ক্ষেত্রে আমরা ইমাম মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কথা মানি। কেরাত বিষয়ে আমরা ইবনুল জাযারী প্রমুখ কেরাত বিশেষজ্ঞের কথা মানি। এগুলো কোনোটিই শিরক হয় না। শুধু মাসআলার ক্ষেত্রে মাসআলা-বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে তাদের কথা মানলে শিরক হয়ে যায়!? একটু ভাবা দরকার। শিরক হলে সবই শিরক হবে, না হলে কোনোটিই হবে না।

একটু আগে আমরা শায়েখ উছাইমীন রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই তাকলীদ চলে এসেছে। আর এটিই হল বাস্তব ইতিহাস।

মাযহাব তো আগে থেকেই চলে এসেছে। কখন কোন্ জায়গায় কোন্ মাযহাব ছিল সে সম্পর্কে আমরা ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর স্পষ্ট বক্তব্য পড়ে এসেছি। মাযহাব মানা যদি শিরক হয়, তাহলে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর শাগরেদদের কী বিধান হবে?

আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্যটি আমরা পুনরায় পড়ে নেব। তিনি প্রত্যেক স্তরে এই তিন সাহাবীর মাযহাব কে অনুসরণ করত এবং সে অনুযায়ী কে ফতোয়া দিত, তাদের অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন। সে নামগুলো আবার একটু পড়ি। তারা কারা?

তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরামের পরে কুরআন ও হাদীসের তথা দ্বীনের বড় বিদ্বান ও ইমাম। তাঁরা যেমন ফিক্হ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে ইমাম, তেমনিভাবে হাদীসের ক্ষেত্রেও ইমাম। তাঁদের মাধ্যমে আমরা হাদীস পেয়েছি। আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আললাইসী রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আন্নাখায়ী রহ., মাসরুক ইবনে আজদা' রহ., ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী রহ., আমের ইবনে শারাহীল আশশাবী রহ., কাবীসা ইবনে যুআইব রহ., সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরী রহ., ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলআনসারী রহ., সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ., তাউস ইবনে কাইসান রহ., মুজাহিদ ইবনে জাব্র রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস রহ., তাঁদের নামগুলো আবার একটু দেখি।

ইবনে মাসউদ রা.-এর মাযহাবের ধারা বর্ণনা শেষে তিনি বলেন, এ মাযহাব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন আবু ইসহাক আসসাবীয়ী রহ., সুলাইমান আলআ'মাশ রহ. ও সুফিয়ান ছাওরী রহ.। আর পরবর্তী যুগে হাদীসের ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রহ. (যিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ও ইবনে মাহদী রহ.-এর বিশেষ উস্তাদ) তিনিও মাযহাব মানতেন।

যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.-এর মাযহাবের ধারা শেষে বলেন, মদীনায় (তাঁর যুগে) এই মাযহাব সম্পর্কে যারা বেশি জানতেন, এই মাযহাব মানতেন এবং প্রচার-প্রসার করতেন, তাদের মধ্যে হলেন ইমাম মালেক রহ., কাসীর ইবনে ফারকাদ রহ. প্রমুখ।

হাদীস শাস্ত্রের বড় ইমাম, ইমাম বুখারীর বিশেষ উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বিশেষ শায়েখ ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. এই মাযহাব মানতেন এবং এই মাযহাবের ওপর অন্য কোনো মতকে প্রাধান্য দিতেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মাযহাবের ধারা শেষে বলেন, এই মাযহাব সম্পর্কে (তাদের যুগে) যারা বেশি জানতেন এবং মাযহাব মানতেন তাদের মধ্যে হলেন ইবনে জুরাইজ রহ., সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.।

এবার লক্ষ করুন, এখানে যে কয়জনের নাম উল্লেখ করা হল তারা সবাই ফিক্হ-ফতোয়া ও মাসআলার ক্ষেত্রে যেমন ইমাম ছিলেন, তেমনিভাবে হাদীসের জগতেও ইমাম ছিলেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের অনেক কিতাবের অনেক হাদীস তাদের মাধ্যমে বর্ণিত। বলা চলে, তারা হাদীস-জগতের নক্ষত্র। শুধু যে হাদীস ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে তা নয়, বরং তাফসীর, আরবী ভাষা এবং পুরো দ্বীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আদব-আখলাক সর্বোপরি দ্বীনের সব কিছুর ক্ষেত্রে তারা ইমাম এবং সাহাবী ও আমাদের মাঝে সেতু-বন্ধন। তাদের মাধ্যমেই আমরা দ্বীন পেয়েছি।

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, কেরাত, আরবী ভাষা, সীরাত, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাদের বর্ণনা ও উক্তিতে ভরপুর।

তাদের প্রত্যেকে সমকালীন যুগের ইমাম, তাদের কাছে হাজারো মানুষ আসত দ্বীন শেখার জন্য, মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য, হাজারো ছাত্র আসত হাদীস শেখার জন্য।

এরাই হলেন ইলমে ওহীর ধারক-বাহক, দ্বীন ও শরীয়তের মুখপাত্র। এদের কাছ থেকেই আমাদেরকে শিখতে হবে কাকে বলে তাওহীদ এবং কাকে বলে শিরক। তা না করে কুরআন সুন্নাহ-এ যে বিষয়ের নির্দেশ এসেছে এবং যার ওপর সাহাবী যুগ থেকে ধারাবাহিক আমল চলে এসেছে এমন বিষয়কে শিরক আখ্যা দেওয়াই মূলত এক ধরনের শিরক। কারণ যে এমন বলে সে আল্লাহর শরীয়তে যে বিষয়টি জরুরি সে বিষয়টিকে হারাম করছে এবং মনগড়া নিজের এই হারাম আখ্যা দেওয়াকে শরীয়তের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

আর একটি সহজ-সরল কথা যে, চার ইমামের পর সমগ্র বিশ্বের মুসলমান, আলেম-উলামা সবাই এই চার মাযহাবকে গ্রহণ করেছেন এবং তা মেনে আসছেন। কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসূলে ফিকহ, উলূমুল হাদীস, সীরাত, ইতিহাস, কেরাত, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাহু-সরফ, বালাগাত, শরহে হাদীস তথা হাদীসের ব্যাখ্যাশাস্ত্র প্রভৃতি যত জ্ঞান ও শাস্ত্র আছে, সকল শাস্ত্রেই যত আলেম-উলামা ও শাস্ত্রজ্ঞ বিগত হয়েছেন, তারা সবাই (সামান্য কিছু ছাড়া) এই চার মাযহাবেরই অনুসারী ছিলেন।

বর্তমানে আমরা ইলমে দ্বীনের যেকোনো ফন ও শাস্ত্র সম্পর্কে জানতে আগের যেকোনো কিতাব খুলি না কেন, তা এসব বরেণ্য আলেমেরই রচিত। তাদের বাদ দিয়ে দ্বীনের শাস্ত্রসমূহের কোনো বিষয় জানা সম্ভব নয়। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনে খুযাইমা, ইমাম ইবনে আবী হাতেম, ইমাম হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, ইমাম বাইহাকী, ইমাম দারাকুতনী, খতীবে বাগদাদী, বাগাভী, ইমাম খাত্তাবী, কুরতুবী, আবুল ওয়ালীদ বাজী, ইমাম নববী, হাফেয ইবনে হাজার, ইবনে বাত্তাল, কাসতাল্লানী, ইবনে আব্দিল বার, কাযী ইয়ায, ইবনে দাকীকুল ঈদ, জামালুদ্দীন মিয্যী, ইবনুস্ সালাহ, হাফেয যাহাবী, ইবনে কাসীর, ইবনুল আসীর, ইবনুল জাওযী, ইবনে রজব হাম্বলী, ইবনে আসাকির, বদরুদ্দীন আলআইনী, ইবনে ওয়াহাব, ইবনুল কাসিম, ইবনু রুশদ, ইবনু কুদামা, খাল্লাল, তহাবী, জাসসাস, ইবনুল হুমাম, কাসেম ইবনু কুতলূবুগা, সাখাভী, সুয়ূতী রহ. প্রমুখ যাঁরা আছেন, তাঁদের সবাই চার মাযহাবের অনুসারী। তাঁদের নামগুলো আবার পড়ি। তাঁরা নক্ষত্র। তাঁরা সবাই পরিচয়ের ঊর্ধ্বে। সবার কাছে পরিচিত। ইসলামী জ্ঞানের প্রতিটি শাখা তাঁদের ও তাঁদের মতো অনেকের রচনায় ভরপুর। কেউ ইসলামী জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে হলে তাঁদের কিতাবের শরণাপন্ন হতে হয়।

এখন তাঁরাই যদি শিরকের মতো এত স্পষ্ট জঘন্য বিষয়টি ধরতে না পারেন, তাহলে তাঁরা হাজারো কিতাব রচনা করে যে গবেষণা পেশ করে গিয়েছেন সেসব গবেষণাই বা কতটুকু সঠিক হবে। কারণ, স্পষ্ট বিষয় যে বুঝে না, সে সূক্ষ্ম বিষয় কীভাবে বুঝবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যে চরমপন্থীগণ তাকলীদ ও মাযহাব অনুসরণকে শিরক বলছেন দ্বীন ও শরীয়তের তালীম ও তাআল্লুম থেকে নিয়ে সকল ইলমী বিষয়ে তাদেরও একমাত্র পাথেয় হচ্ছে এসব ইমাম ও আলেমদের রচনা ও সংকলন। তাও তাদের একটু হুঁশ হয় না যে, নিজেদের গোমরাহিটা একটু আঁচ করবে।

তুর্কি খেলাফতের পর বর্তমান পর্যন্ত আরব বিশ্বের ঈমান-আকীদার যিনি আদর্শ, যাকে তারা একবাক্যে ইমাম মনে করেন, যিনি তাদের সংস্কৃতির নেতা শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আন্নাজদী রহ., যাঁর ব্যাপারে তাওহীদের কোনো কোনো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ির অভিযোগ, তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং অন্যান্য মাযহাবকে সম্মান করতেন। বরং মুসলমানদেরকে এই চার মাযহাবের কোনো একটি মানতে বলতেন। তিনি বলেন-

وَنَحْنُ أَيْضًا فِي الْفُرُوْعِ عَلٰى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَلَا نُنْكِرُ عَلٰى مَنْ قَلَّدَ أَحَدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ لِعَدَمِ ضَبْطِ مَذَاهِبِ الْغَيْرِ، اَلرَّافِضَةِ وَالزَّيْدِيَّةِ وَالْإِمَامِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ،وَلَا نُقِرُّهُمْ ظَاهِرًا عَلٰى شَيْءٍ مِنْ مَذَاهِبِهِمِ الْفَاسِدَةِ، بَلْ نُجْبِرُهُمْ عَلٰى تَقْلِيْدِ أَحَدِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ.

'ফিকহী বিষয়ে আমরাও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। যারা চার মাযহাবের কোনো মাযহাবের তাকলীদ করে আমরা তাদের ওপর কোনো আপত্তি করি না। আর যেমন, যায়দিয়া, ইমামিয়া, শিয়া ইত্যাদি; তাদের বাতিল মাযহাবকে আমরা স্বীকৃতি দিই না। বরং তাদেরকে চার ইমামের কোনো ইমামের তাকলীদ করতে বাধ্য করি।' আদ্দুরারুস সানিয়া ১/১২৭

একবার তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়, তিনি নাকি চার মাযহাব মানেন না এবং তা বাতিল বলেন। এর খ-নে তিনি বলেন-

قَوْلُهُ: إِنِّيْ مُبْطِلُ كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَإِنِّيْ أَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ مُنْذُ سِتِّ مِائَةِ سَنَةٍ لَيْسُوْا عَلَى شَيْءٍ وَإِنِّيْ أَدَّعِي الاِجْتِهَادَ وَإِنِّيْ خَارِجٌ عَنِ التَّقْلِيدِ، هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ.

'যারা বলে আমি চার মাযহাবের গ্রন্থগুলো বাতিল বলি এবং বলি, মানুষ ছয়শ বছর ধরে ভুলের ওপর আছে, আমি নাকি ইজতেহাদের দাবি করি এবং আমি নাকি তাকলীদ করি নাএগুলো সবই ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ।' আর-রাসায়েলুস শাখছিয়্যা ৪

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. যিনি পুরো সৌদি আরবে আপন গুণে বরণীয় ও স্মরণীয়, তাঁকে তাঁর মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

مَذْهَبِيْ فِي الْفِقْهِ هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ.

'ফিকহের ক্ষেত্রে আমার মাযহাব হল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর মাযহাব।' মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায ৪/১৬৬

তিনি আরো বলেন-

وَأَتْبَاعُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ كُلُّهُمْ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، يَعْتَرِفُوْنَ بِفَضْلِ أَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَيَعْتَبِرُوْنَ أَتْبَاعَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ إِخْوَةً لَهُمْ فِي اللهِ.

'শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদীর অনুসারী সবাই হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তারা চার ইমামকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন এবং চার মাযহাবের অনুসারীদেরকে দ্বীনী ভাই মনে করেন।' প্রাগুক্ত ৫/১৫০

সৌদি আরবের উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য সৌদি আরবের অন্যতম আলেম শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ.-এর একাধিক বক্তব্য আমরা আগেই পাঠ করেছি, যা মাযহাব ও তাকলীদের সত্যতার বিষয়ে সুস্পষ্ট। এখানে তাঁর আরেকটি বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি নিজের মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

نَحْنُ الْآنَ مَذْهَبُنَا مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

'বর্তমানে আমাদের মাযহাব হল ইমাম আহমদ রহ.-এর মাযহাব।' লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ ১২/১০০

সৌদি আরবের আরেক শীর্ষস্থানীয় আলেম শায়েখ সালেহ ফাওযান মাযহাব মানার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন-

هَاهُمُ الأَئِمَّةُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ الْكِبَارِ كَانُوْا مَذْهَبِيِّيْنَ، فَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ كَانَا حَنْبَلِيَّيْنِ، وَالْإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ شَافِعِيَّيْنِ وَالْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ كَانَ حَنَفِيًّا وَابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ كَانَ مَالِكِيًّا.

'বড় বড় হাদীস বিশারদ ইমামগণ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং ইবনুল কায়্যিম রহ. ছিলেন হাম্বলী, ইমাম নববী রহ. ও ইবনে হাজার রহ. ছিলেন শাফেয়ী, ইমাম তাহাবী রহ. ছিলেন হানাফী, ইবনে আব্দুল বার রহ. ছিলেন মালেকী।' ইয়ানাতুল মুসতাফীদ ১/১২

আরব বিশ্বের আলেমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করতে গেলে আরো বহু বক্তব্য তুলে ধরা যাবে। কারণ, বিন বায রহ.-এর এক বক্তব্যে আমরা পড়েছি, শায়েখ নাজদীর অনুসারী সবাই হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আর তাদের চিন্তা-চেতনায় গড়া বর্তমান আরব বিশ্ব। তাই এই ভূখন্ডের মূল ধারার সবাই মাযহাব অনুসারী। যে দু-চারজন চরমপন্থী তাকলীদ ও মাযহাব অনুসরণকে শিরক বলে তারা যদি একটু ভাবত যে, এ কেমন শিরক হল নজদীরাই তাকে শিরক মনে করে না, বরং জরুরি মনে করে। অথচ নজদীদের ব্যাপারে এ কথা স্বীকৃত যে, তারা সামান্য সামান্য কারণে শিরক নয় এমন অনেক কিছুকে শিরক বলে দেয়।

কিছু চরমপন্থীকে দেখা যায় তারা মুফতীর তাকলীদ এবং ইমামের অনুসরণকে পোপের অন্ধ অনুসরণের সঙ্গে মেলায়। এরা মূলত ইমামদের মকাম ও মর্যাদা এবং তাঁদের মাযহাবের উসূল সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ এবং খ্রিষ্টানদের কাছে পোপের যে অবস্থান সে সম্পর্কেও অজ্ঞ। মুসলমানদের কাছে মাযহাবের ইমামগণের অবস্থান কোনোভাবেই এমন নয় যেমন খ্রিষ্টানদের কাছে পোপের অবস্থান। এ বিষয়ে যেহেতু শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম 'তাকলীদ কী শরঈ হাইসিয়ত'-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং হযরত মাওলানা সরফরায খান রহ. এর আলোকে আরো বিস্তৃত লিখেছেন, তাই এ বিষয়ে বেশি কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি না।

কেউ কেউ তাকলীদের ওপর আরেক আজব আপত্তি তোলেন। তাকলীদ নাকি বাপদাদার অনুসরণ, যা মক্কার কাফেররা করত। আর এর কারণেই তারা হেদায়েতের পথে আসতে পারেনি। তাই পবিত্র কুরআনে এর বহু নিন্দা এসেছে।

মূলত কুরআনের এসব আয়াতের অর্থ না বোঝা এবং একপেশে জানাশোনাই হল এ ভুল আপত্তির কারণ।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

‘যখন তাদেরকে (কাফেরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে না, আমরা তো কেবল সেগুলোরই অনুসরণ করব, যার ওপর আমরা আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি। আচ্ছা, যদিও তাদের বাপদাদা কোনো কিছু বুঝত না এবং হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।’ সূরা বাকারা ১৭০

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(তরজমা) যদিও তাদের বাপদাদা কিছু জানত না এবং হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।’ সূরা মায়েদা ১০৪

অর্থাৎ তারপরেও তাদের অনুসরণ করে।

পূর্ণ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, বাপদাদাদের অনুসরণের নিন্দা আল্লাহ তাআলা এজন্য করেছেন, সেসব বাপদাদা না কিছু জানত, না বুঝত, না হেদায়েতের ওপর ছিল। আর এক্ষেত্রে সামান্যতম একজন বিবেকের অধিকারী মানুষও বলবে, যারা জানে না, বুঝে না, হেদায়েতপ্রাপ্ত নয়, তাদের অনুসরণ ভুল ও নিন্দনীয়।

কিন্তু যদি বাপদাদারা জানে বুঝে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে একজন সামান্যতম বিবেকবান মানুষও বলবে না যে এ ধরনের বাপদাদার অনুসরণ নিন্দনীয়, বরং এ ধরনের অনুসরণ যথার্থ ও কাম্য।

খোদ আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদেই এ ধরনের অনুসরণের প্রশংসা করেছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন জেলখানায় বন্দী, তখন তাঁর দুই সহবন্দী স্বপ্ন দেখে, সে স্বপ্ন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন-

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

‘আমি সে জাতির ধর্ম ছেড়ে দিয়েছি, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না এবং আখেরাত অস্বীকার করে। আর অনুসরণ করেছি, আমার বাপদাদা ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম।’ সূরা ইউসুফ ৩৭-৩৮

ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা ইয়াকুব, তাঁর পিতা ইসহাক, তাঁর পিতা ইবরাহীম আলাইহিমুস সালাম।

এখানে ইউসুফ আ. স্পষ্ট বলেছেন, তিনি তাঁর বাপদাদার ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এটা সত্য ও গর্বের বিষয় মনে করে সহবন্দীদের এই বলে দাওয়াত দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে বিষয়টি পছন্দ হয়েছে বলে সরাসরি কুরআনেও নাযিল করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের তা শিক্ষা দিয়েছেন।

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যখন মৃত্যুপথের যাত্রী তখন তাঁর ছেলেদের সবাইকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে? ছেলেরা সমস্বরে উত্তর দিল, আমরা

আপনার এবং আপনার বাপদাদার মাবুদের ইবাদত করব, তাঁকেই মানব। এই বিষয়টিও আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۖۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾

‘তোমরা নিজেরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়। যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সবাই বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবুদ, আপনার বাপদাদা ইবরাহীম ইসমাঈল ইসহাকের মাবুদ, আমরা কেবল তারই অনুগত।’ সূরা বাকারা ১৩৩

তো এখানে ইয়াকুব পুত্রদের কথা ও ওয়াদা ‘আপনার বাবা ও পরদাদা ইবরাহীম, ঈসমাইল ও ইসহাকের মাবুদেরই ইবাদত করব।’ বাপ-দাদার অনুসরণের এর চেয়ে দৃঢ় কথা ও ওয়াদা আর কি হতে পারে? আর ইয়াকুব আলাইহিস সালামও এ ওয়াদায় আশ্বস্ত হলেন।

আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভালো লেগেছে। তাই আমাদেরকে শেখানোর জন্য তা জানিয়েছেন এবং সরাসরি কুরআনে নাযিল করেছেন।

উভয় ধরনের আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, বাপ-দাদা যদি হেদায়েত ও সত্যের ওপর থাকে, তাহলে তাদের অনুসরণ ভালো এবং কাম্য, বরং আবশ্যক আর যদি হেদায়েত ও সত্যের ওপর না থাকে, তাহলে তাদের অনুসরণ নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

এবার আমরা ভেবে দেখি, যারা চার ইমামের অনুসরণ করে তারা কোন অনুসরণ করে? মক্কার কাফেরদের অনুসরণ, নাকি ইয়াকুব-পুত্রদের অনুসরণ? চার ইমামকে মানার অর্থ হল, এই চার ইমাম যেসব ফতোয়া দিয়েছেন সেসব মানা। এই চার ইমাম ছিলেন তাদের যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকীহ। হাজার হাজার ছাত্র ও সাধারণ মানুষ তাদের থেকে দ্বীন শিখেছে, কুরআন হাদীস শিখেছে, মাসআলা-মাসায়েল জেনেছে। ওই যুগের আলেম-উলামা তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই তাদের পর থেকে এ পর্যন্ত সকল আলেম-উলামা সাধারণ মুসলমান প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের সেসব ফতোয়া অনুসরণ করে আসছে। তারা নিঃসন্দেহে হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন, অন্যদের তুলনায় বহুগুণ বেশি শরীয়তের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তারা যদি হেদায়েতপ্রাপ্ত না হতেন এবং তাদের বুঝ-সমঝ না থাকত, তাহলে তাদের যুগের আলেমগণ তাদেরকে ফতোয়ার আসনে বসাতেন না এবং তৎকালীন ও পরবর্তী সবাই তাদের অনুসরণ করতেন না।

পক্ষান্তরে মক্কার কাফেররা, তারা যাদের অনুসরণ করত, তারা তো নিঃসন্দেহে হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিল না। তেমনি তারা ছিল নির্বোধ, গোড়া ও অহংকারী। তারা হেদায়েত বোঝার চেষ্টাও করেনি।

তাহলে এখন পরিষ্কার, চার ইমামের অনুসরণ আর মক্কার কাফেরের অনুসরণ এক নয়। বরং উভয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। একটির ভিত হল হেদায়েতের ওপর, আরেকটি ভিত হল ভ্রষ্টতার ওপর। সুতরাং একটির নিন্দা অপরটির ওপর চাপিয়ে দেওয়া জঘন্য অজ্ঞতা এবং অপরাধ। এখানে আরো দুটি বিষয় লক্ষণীয়

এক. যেসব আয়াতে মুশরিকদেরকে তাদের বাপদাদার অনুসরণের নিন্দা করা হয়েছে, সেগুলো তো চার ইমামের অনুসারী সকল আলেম-উলামা তেলাওয়াত করে আসছেন। এসব আয়াতের অর্থ যদি এমন হয় যেমন অভিযোগ উত্থাপনকারী বলেছে, তাহলে এ পর্যন্ত সকল আলেম চার মাযহাব মেনে আসছেন কেন? আমরা যেমন

সত্য পেতে চাই তারা কি তা চাইতেন না? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের যে স্পৃহা আমাদের, তাদের কি তা ছিল না, নাকি একবাক্যে বলে দেব সবাই ভুল করেছেন? তখন প্রশ্ন, একটি জ্বলন্ত সত্য বিষয় হাজার বছরের সমগ্র আলেম-উলামা কেউ বুঝলেন না, হাজার বছর পর আমি বুঝলাম কী করে? আর কুরআন হাদীসের একটি তথ্য এত বছর গোপন থাকে কী করে?

দুই. আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মাযহাব চার ইমাম থেকেই সূচিত নয়, বরং তা আগে থেকেই চলমান এবং তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী অনেক আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সেসব মাযহাব মানতেন। তাহলে এসব আলেমের ব্যাপারে কী মন্তব্য করা হবে?

প্রশ্ন হয়, আমরা যতটুকু সত্য জানা ও মানার স্পৃহা রাখি, একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে চাই, তাদের কি এ স্পৃহা ছিল না? এসব আয়াত থেকে আমরা যা বুঝেছি তারা তা বুঝে থাকলে কেন মাযহাব বর্জন করেননি?

সত্য প্রজন্ম পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়। যেমন, আমরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথায় দেখতে পেলাম। আমাদের ইসলাম ধর্মও সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী হয়ে এভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় এসেছে। এজন্য এমন কোনো আমল যা আগের বিশেষভাবে প্রথম তিন স্বর্ণযুগে তার প্রচলন পাওয়া যায় না, তা উলামায়ে কেরামের কাছে পরিত্যাজ্য। কেননা, নবীজী থেকে দ্বীন শিখেছেন সাহাবীগণ, সাহাবীগণ থেকে তাবেয়ীগণ এভাবে আমাদের পর্যন্ত। নবীজীর পেছনে নামায পড়েছেন সাহাবীগণ, আমরা নই। সাহাবীগণ তাবেয়ীগণকে শিখিয়েছেন। এভাবে আমাদের পর্যন্ত ধারা চলে এসেছে। তাই কোনো আমল যদি এ ধারাতে পাওয়া না যায় অথবা এ ধারার বিপরীত হয়, তা উলামায়ে কেরামের কাছে পরিত্যাজ্য।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ আননাখায়ী (যিনি অনেক হাদীসের বর্ণনাকারী, সহীহ বুখারীতেও তার বর্ণনা রয়েছে) এক জায়গায় গেলেন। সেখানকার লোকজন তাকে বলল, আমাদের এলাকায় মুতাযিলা ফেরকার কিছু লোক আছে, যারা জান্নাতে আল্লাহ তাআলাকে দেখা, শেষরাতে আল্লাহ তাআলার দুনিয়ার আসমানে নেমে আসাএসব হাদীস অস্বীকার করে। তখন শারীক রেগে গিয়ে এ ধরনের আরো দশটি হাদীস পাঠ করলেন। এরপর বললেন, আমরা তো আমাদের দ্বীন তাবেয়ীদের থেকে শিখেছি, তারা সাহাবীদের থেকে। আর মুতাযিলারা কার কাছ থেকে শিখেছে? অর্থাৎ মুতাযিলা ফেরকা নবআবিষ্কৃত, যা সাহাবী-তাবেয়ীর যুগে ছিল না। তাই তাদের ধর্মবিশ্বাস বিচ্ছিন্ন। সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৫০

তাই বাপ-দাদারা যদি হেদায়েতের ওপর থাকেন তাহলে তাদের অনুসরণ করাই শরীয়তের হুকুম।

আরেকটি বিষয় হল, মুশরিকরা তো আল্লাহ তাআলার বিধানকে না-মানার জন্যই বাপ-দাদার দোহাই দিয়েছে। কিন্তু বারোশ বছর যাবৎ লক্ষ লক্ষ আলেম, বিভিন্ন শাস্ত্রের ইমাম, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ কি চার ইমামকে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করার জন্য মেনে আসছেন, নাকি শরীয়ত বোঝার ও মানার জন্যই তাদেরকে অনুসরণ করে আসছেন?

তো এতে মুশরিকদের সঙ্গে কী সাদৃশ্য হল?! এটা তো বরং বিলকুল আলাদা রাস্তা, যা হেদায়েতের রাস্তা, যা কুরআনী নির্দেশ-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ.

মোতাবেক আমলমাত্র।

যারা বাপ-দাদার অনুসরণ বলে চার মাযহাব মানে না, বরং নিজেদের 'গবেষক'দের মানে, তাদেরও কিন্তু একটি ধারা আছে, যদিও তা ক্ষুদ্র। এ জন্য দেখা যায়, তাদের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত সবার মৌলিকভাবে মত ও পথ এক, ফতোয়া ও আমল একই ধরনের। তো চার ইমামের ধারার ওপর তারা যে প্রশ্ন অন্যায়ভাবে উত্থাপন করে, একই আপত্তি তাদের ধারার ওপরও উত্থাপিত হতে পারে। তবে তা হবে হয়ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, ইমামদের মানতে অসুবিধা নেই, কিন্তু ইমামগণ তো মানুষ। আর মানুষমাত্রেরই ভুল হতে পারে। সুতরাং যেখানে তাদের ভুল হয়, সেখানে তাদের কথা আঁকড়ে ধরে রাখার বৈধতা নেই। তেমনিভাবে তারা সবাই বলেছেন, সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সেটিই তাদের মাযহাব। তো যেখানে ইমামদের কথার বিপরীতে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, সেখানে হাদীস না ধরে ইমামদের কথা ধরে রাখা অবশ্যই গোমরাহি।

মানুষের জানাশোনা সবকিছুই সীমাবদ্ধ। তাই তার ভুল হওয়া সম্ভব। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয় যে, তার ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে এমন আছেন যার ভুল না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে কখনো ভুল হয়ে যায়। এমনিভাবে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না যে, তাতে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক বিষয় এমন আছে যাতে সাধারণত কারোরই ভুল হয় না। যদিও ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই কদাচিৎ এসব ক্ষেত্রেও কারো থেকে ভুল হয়ে যায়। তো ভুল হতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে যে কারো ব্যাপারে বা যেকোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই ভুলের দাবি করে বসা ঠিক নয়। এখন দেখার বিষয়, শরীয়তে বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে ভুলের বিধান কী?

হাদীসে আছে, যখন ইসলামী বিচারক তার বিচারকাজে সঠিক সিদ্ধান্তটি পাওয়ার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, এরপর যদি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যা সত্য তা উদ্ঘাটন করতে না পারে, তাহলেও সে একগুণ সওয়াব পাবে। ইসলামী বিচারক আর মুফতীর কাজ একই, দুইজনের বিধানও এক। শুধু এ দুজনই নয়, বরং ইসলামী যত বিষয় আছে সব বিষয়েই গবেষণাকারী ব্যক্তি এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, আসল সত্যে পৌঁছাতে পারলে দ্বিগুণ সওয়াব, নইলে গোনাহ নেই, বরং একগুণ সওয়াব পাবে। এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের সবাই একমত। এ থেকে বোঝা যায়, শুধু মাসআলার ক্ষেত্রে যে এমন তা নয়, বরং যেকোনো শাস্ত্রের গবেষকেরই ভুল

হতে পারে। হাদীস শাস্ত্রে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম আবু দাউদ রহ. ইমাম তিরমিযী রহ. প্রমুখ, তাফসীরের ক্ষেত্রে মুজাহিদ ইবনে জাব্র রহ. কাতাদা ইবনে দিআমা আসসাদুসী রহ. ইবনে জারীর রহ. প্রমুখ, নাহুর ক্ষেত্রে সিবওয়াইহ রহ. আখফাশ রহ. প্রমুখ। মোটকথা যেকোনো শাস্ত্রে যেকোনো ইমামেরই ভুল হতে পারে।

আর এটা স্পষ্ট বাস্তবতাও, যা যেকোনো বিবেকবান মানুষ মানে এবং জানে। সে হিসেবে ইমামদেরও ভুল হতে পারে এবং হাজার হাজার মাসআলার সমাধানের মধ্যে দু-একটি সমাধানে ভুল হতেই পারে। কোনো ইমাম নিজেকে এমন ভুল থেকে মুক্ত বলেননি এবং বলতেও পারেন না। আর যদি কেউ এমন দাবি করে, তা পরিত্যাজ্য বিবেক বিবর্জিত। সে ইমাম হওয়ারই যোগ্য নয়।

তবে এক্ষেত্রে দেখার বিষয় হল, তাদের ভুলের পরিমাণ কত? এবং সেগুলোকে কেউ আঁকড়ে ধরে রেখেছে কি না? একজন গাড়ি চালক যখন প্রথম গাড়ি চালনা শিখতে থাকে, তখন তার প্রচুর ভুল হয়। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে সে এতে পাকা হয়ে যায় তখন তার ভুলের সংখ্যা কমতে থাকে এবং এক সময় ভুলের সংখ্যা এত কমে আসে যে, প্রশিক্ষক তাকে একাই গাড়ির আসনে বসিয়ে দেয় এবং একাই গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়ে দেয়। এর পরও তার ভুল হয় না এমন নয়, ঘটনাচক্রে দু-একবার দুর্ঘটনাও ঘটে।

এটা শুধু গাড়ি চালনার ক্ষেত্রে নয়, বরং পৃথিবীর যেকোনো বিদ্যা ও শাস্ত্রের ক্ষেত্রে একই কথা। ফিক্হ ও ফতোয়া এটি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। কুরআন হাদীস মুখস্থ থাকলেই যে ফতোয়া দিতে পারে এমনটি নয়। এ যোগ্যতা অনেক সূক্ষ্ম এবং অনেক বুঝ-বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতার দাবিদার। এজন্যই সাহাবীদের মাঝে মাত্র কিছু সাহাবীই ফতোয়া প্রদান করতেন।

তো এ ফিক্হবিদ্যাও শিক্ষকের সংশ্রবে ও তত্ত্বাবধানে থেকে শিখতে হয়। শিখতে গিয়ে হাজারো ভুল হয়, শিক্ষক শুধরে দেন। এভাবে শুধরে দিতে দিতে এক সময় তার ভুলের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং একেবারেই কমে যায়। তখন শিক্ষক তাকে ফতোয়ার আসনে বসার অনুমতি দেন। এজন্য মুফতী হওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত হল সমকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বীকৃতি দিতে হবে যে, তিনি ফতোয়া প্রদানে উপযুক্ত।

ইমাম মালেক রহ. বলেন-

> مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُونَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ.
>
> 'আমি ততদিন পর্যন্ত ফতোয়া দিইনি, যতদিন পর্যন্ত সত্তরজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আমার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেয়নি যে, আমি ফতোয়া প্রদানের যোগ্য।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫

ইমাম মালেক রহ.-এর বন্ধু খালাফ ইবনে ওমর রহ. বলেন আমি ইমাম মালেককে বলতে শুনেছি, আমি আমার থেকে জ্ঞানী যারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া ফতোয়ার কাজে ব্রত হইনি। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা কি আমাকে এর যোগ্য মনে করেন? আমি রবীআকে জিজ্ঞেস করেছি, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আলআনসারীকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে এ কাজের আদেশ দিয়েছেন। ইমাম মালেক রহ.এর বন্ধু বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, তারা যদি আপনাকে নিষেধ করতেন, তাহলে আপনি কি বিরত থাকতেন? ইমাম মালেক রহ. বলেন, অবশ্যই বিরত থাকতাম। কেননা, কোনো ব্যক্তির জন্য তার থেকে জ্ঞানী যারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া কোনো কিছুর যোগ্য মনে করা ঠিক না।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫

অনুরূপ অন্য ইমামগণও।

এবার একটু ভাবি, ইমাম মালেক রহ. যাকে তৎকালীন সত্তরজন ফকীহ ফতোয়াদানের যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার সে সত্তরজনও তৎকালীন বড় বড় ইমাম ফকীহ যেমন, রবীআ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলআনসারী রহ. প্রমুখ। সেই ইমাম মালেক রহ. ভুল করলে কত ভুল করতে পারেন?!

চার ইমামের প্রত্যেক ইমামই তাদের যুগের বড় বড় ফতোয়াবিদ শ্রেষ্ঠ উস্তাযগণের হাতে গড়া শাগরেদ, তাদের স্বীকৃতি ও আদেশের পরই তাঁরা ফতোয়ার আসনে বসেছেন। তো ওই যুগের বড় বড় পণ্ডিতদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভুল করলে কত জায়গায়ই বা ভুল করতে পারে! এটা খুবই সোজাসাপটা হিসাব, ভুল হলে সামান্যই ভুল হতে পারে। যেমনটি সামান্য যান চালনাসহ জাগতিক সব বিদ্যার ক্ষেত্রে বিষয়টি সহজে বুঝে আসে।

মোটকথা, মানুষ হিসেবে ইমামদের ভুল হতে পারে। বাকি, তার মানে এমন নয়, নাভির নিচে হাত বাঁধা, মুক্তাদীর কেরাত না পড়া, আমীন আস্তে পড়া, রাফয়ে ইয়াদাইন না করা, সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রাখা, দ্বিতীয় রাকাতে ওঠার সময় প্রথমে বসা বা এজাতীয় দুরাকাত নামাযের সবকটি মাসআলায় ভুল করে ফেলেছেন। তাহলে এই ব্যক্তি ইমাম হওয়া তো দূরের কথা সাধারণ আলেম হওয়ারও যোগ্যতা রাখেন না।

একজন মানুষ ও মুফতী হিসেবে ইমামগণ ভুলের ঊর্ধ্বে নন। তবে সে ভুল সীমিত। আমরা যেভাবে এই বুলিটি আওড়াই, তাতে বোঝা যায়, তাদের বহু মাসআলায় ভুল হয়েছে। আসলে যদি বিষয়টি এমন হয়, তাহলে তাদেরকে যারা স্বীকৃতি দিলেন, তাদের প্রাজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

চার ইমাম যেসব ফতোয়া দিয়েছেন, তাদের যুগ থেকে সেগুলো হাজার বারোশ বছর যাবৎ চর্চিত হয়ে আসছে। প্রত্যেকটি মাসআলার দলিল-প্রমাণসহ যাবতীয় দিক নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা-পর্যালোচনা

কিন্তু যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। চার ইমামের পর হাজার হাজার আলেম-উলামা গত হয়েছেন, যারা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের তাগিদেই চার ইমামের ফতোয়াগুলো পরখ করেছেন এবং ভুলগুলো চিহ্নিত করেছেন। সেক্ষেত্রে যা সঠিক ও শক্তিশালী সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। ইমামের ফতোয়া বাদ দিয়ে দিয়েছেন। চার মাযহাবের প্রতিটিতেই এমন কিছু মাসআলা রয়েছে, যেগুলোতে ইমামের ফতোয়া বাদ দিয়ে সঠিক ও শক্তিশালী মত গ্রহণ করা হয়েছে। ফিক্হ শাস্ত্রের নগণ্য ছাত্রও বিষয়টি জানে। সুতরাং এখন এমন বলা যে, চার ইমামের তো ভুল হতে পারে, তাই মাযহাব বাদ দিতে হবে। এমন কথা বলার সুযোগ নেই। এরপরও যদি এমন কোনো মাসআলা পাওয়া যায়, যেখানে চার ইমামের কোনো ইমাম বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন, তার কথার কোনো গ্রহণযোগ্য দলিল নেই, পক্ষান্তরে বিপরীতে সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস বা অন্য কোনো দলিল আছে, তাহলে যেকোনো মাযহাবের উলামায়ে কেরাম তা গ্রহণ করবেন, বরং গ্রহণ করতে বাধ্য।

এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সঙ্গে বুঝতে হবে। তা হল কোনো ফতোয়ার ক্ষেত্রে ইমামের ভুল হওয়া তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন ইমামের ফতোয়ার পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য দলিল না থাকবে। তাঁর ফতোয়ার পক্ষে না আছে কুরআন হাদীস, না আছে সাহাবা-সালাফের আমল, বরং তার বিপরীতে স্পষ্টভাবে আয়াত, হাদীস অথবা জুমহুরে সালাফের আমল রয়েছে অথবা ইমামের ফতোয়ার স্বপক্ষে হাদীস রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা সর্বসম্মতিক্রমে নিতান্তই দুর্বল, তার বিপরীতে স্পষ্ট সহীহ হাদীস রয়েছে। এ ধরনের অবস্থাগুলোতে বলা যাবে, ইমাম এগুলোতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

কিন্তু অনেক সময় হয় কি, একটি মাসআলার ক্ষেত্রে একাধিক হাদীস রয়েছে, যেগুলোর একটি অপরটির সঙ্গে বাহ্যত অমিল। সেক্ষেত্রে ইমাম তাঁর গবেষণা ও মূলনীতি অনুসারে এসব হাদীস থেকে একটি হাদীস আমলের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেন। অন্যগুলো তাঁর কাছে রহিত বা বিশেষ কোনো অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সাধারণ বিধান নয়। তাই

প্রথমটি অনুসারে ফতোয়া প্রদান করেন। পক্ষান্তরে অন্য কেউ তার নিজস্ব ইজতেহাদ ও গবেষণা অনুসারে সে হাদীসকেই প্রাধান্য দেন, যা ইমাম রহিত বা নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে বলেছেন আর তিনি ইমামের হাদীসকেই রহিত বলেন। এখন যদি তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন যে, ইমামের মাযহাব দুর্বল; ইমাম এক্ষেত্রে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এটা নিতান্তই মূর্খতা হবে।

কেননা, এক্ষেত্রে ইমামের দলিলও শক্তিশালী। তার সঙ্গে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীও আছেন। তারাও ইমামের সঙ্গে একমত।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, হাদীস একটিই। একে অনেকে সহীহ বলেছেন। ইমামও সহীহ বলেছেন। কিন্তু কেউ যদি নিজস্ব প্রকৃতি ও গবেষণা হিসেবে হাদীসটিকে যয়ীফ বলে দেন। আর তখনই বলে ওঠেন ইমামের মাযহাব যয়ীফ। তার ভুল হয়েছে। তাহলে এ ধরনের কর্মপন্থা ভুল। কেননা, আমার গবেষণার বিপরীত হলেই তা ভুল হবে এমন অথরিটি আমার গবেষণাকে কে দিয়েছে? এখানে তো ইমামেরও দলিল আছে এবং সেটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে শাস্ত্রীয় দলিলও আছে।

ভালোভাবে বোঝা দরকার, আমার গবেষণার বিপরীত হওয়ার কারণে যদি অথবা আমার কাছে ইমামের হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণে যদি বলি, ইমাম এখানে ভ্রান্তির শিকার। তাহলে ইমাম ও তাঁর অনুসারীরাও বলতে পারবে, আপনিও ভ্রান্তির শিকার। কেননা, আমি যে হাদীসটিকে সহীহ বলেছি, সেটি তাদের কাছে দুর্বল। আমি যেমন এসব মাসআলায় মাযহাব অনুসারীদেরকে বলি মুশরিক, তারাও আমাকে বলবে মুশরিক। আজ যে ভাইয়েরা ইমামের ভুল বলে বেড়ায়, তাদের সব ভুল ধরা এ প্রকৃতিরই।

উদাহরণস্বরূপ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাসআলা মুক্তাদীর সূরা পাঠের মাসআলাটিই ধরা যাক। তারা এক্ষেত্রে কত জোরে-শোরে বলে বেড়ায়, ইমাম আবু হানীফা এতে ভুলের শিকার। কেননা, সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করল না, তার নামায হবে না। আর যারা এই ভুল আঁকড়ে ধরে আছে তারা শিরক করছে। অথচ এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বহু দলিল রয়েছে। কুরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াত রয়েছে, শুধু একটি দুটি নয় চার-পাঁচটি সহীহ হাদীস রয়েছে। হযরত উমর রা. আলী রা. ইবনে মাসউদ রা. যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. প্রমুখ বড় বড় সাহাবীর আমল রয়েছে। যার কিছু আলোচনা পেছনে গেছে এবং সামনেও কিছু আসবে। এবার চিন্তা করি, সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাসআলায় যদি এমন হয়, বাকিগুলোয় কেমন হবে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার তা হল, যেকোনো গবেষক, মুফতী, বিচারক ভুল করতে পারে, যেমন ইমামগণ ভুল করতে পারেন। তেমনিভাবে বর্তমানে যারা ইমামদেরকে না মেনে শায়েখদের মানে, এসব শায়েখও ভুল করতে পারেন। বরং এসব গবেষকের ভুল হওয়ার সম্ভবনা আরো বেশি। কেননা, ইজতেহাদ তথা কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি বিধান আহরণের জন্য যত ব্যাপক যোগ্যতা দরকার, ফতোয়ার মতো নাজুক ও সূক্ষ্ম কাজে যে ধরনের দক্ষতা, বোঝ ও সমঝ দরকার, জানা কথা যে এগুলো বর্তমানের শায়েখদের তুলনায় স্বর্ণযুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেক বেশি ছিল। বর্তমান গবেষকদের উস্তাযদের তুলনায় সেসব স্বর্ণযুগের উস্তাযদের যোগ্যতা ও দ্বীনী দক্ষতা সবকিছু বেশি ছিল।

বর্তমান ইসলামী বিচারকদের তুলনায় স্বর্ণযুগের বিচারকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বেশি ছিল। আর জানা কথা, যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বেশি হয়, তাদের ভুলের আশঙ্কাও হ্রাস পায়। যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কম, তাদের ভুলের আশঙ্কা ও সংখ্যা বেশি হয়।

কিন্তু 'চার ইমামের ভুল হতে পারে' এ কথাটি ওই ভাইয়েরা যেভাবে বলে থাকে, তাতে মনে হয় তাদের শায়েখদের কোনো ভুলই হয় না। নিজেদের বিষয়ে সত্যকে চাপিয়ে এমন সুধারণা আর যারা সর্বক্ষেত্রে তাদের থেকে প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সৎ ও মুত্তাকী তাদের ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের বিষয়ে কুধারণা! এটা কেমন বিবেকের কথা? আল্লাহ তাআলা আমাদের রহম করুন, আমীন।

সারকথা, মানুষ হিসেবে চার ইমামেরও ভুল হতে পারে। তবে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, আপন উস্তাদদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য, দক্ষতা, তাকওয়া ও পরহেযগারির আধিক্যের কারণে তাদের ভুল খুব কমই হয়েছে। আর তাদের ফতোয়াসমূহ হাজার বছর যাবৎ চর্চিত হয়ে আসার ফলে তাদের সেসব ভুলও চিহ্নিত হয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে সঠিক মতটিই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এমন বলার আর অবকাশ নেই যে, ইমামের ভুল আঁকড়ে ধরে শিরক করছে।

এই ভাইয়েরা যে বুলিগুলো বেশি আওড়ায় তার মধ্যে এই বাক্যটি অন্যতম। তারা এই বাক্যটি গলদ অর্থে ব্যবহার করে। তাই সঙ্গত মনে হচ্ছে, এই বাক্যটির হাকীকত ও স্বরূপ এবং এর সঠিক ব্যবহার পরিষ্কার করে দেওয়ার। এতে সংশয় নিরসন হবে ইনশা-আল্লাহ।

কোনো মাসআলা যখন ফকীহের কাছে আসে, তখন তার কর্তব্য হল কুরআন হাদীস ও যাবতীয় দলিল-প্রমাণ গবেষণা করে সঠিক সমাধান উদ্ঘাটন করে প্রশ্নকারীকে জানানো। যাতে প্রশ্নকারী আল্লাহর বিধানমতো আমল করতে পারে। তাই একজন ফকীহের জন্য সহীহ হাদীস ও সহীহ দলিলের বিকল্প নেই। কারণ, ফকীহ যদি সহীহ হাদীস গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি আল্লাহর সঠিক বিধানের খোঁজ পাবেন না। তখন ওই সমাধান অনুযায়ী আমলকারীও আল্লাহর বিধানমতো আমল করতে পারল না। এজন্যই যে ব্যক্তি কুরআন হাদীসের বিপরীত ফতোয়া প্রদান করে তার প্রতি কুরআন হাদীসে কঠিন ও ভয়ংকর হুঁশিয়ারি এবং লানত করা হয়েছে। তাই কোনো মুফতী, এমনকি বর্তমান সময়কার একজন সাধারণ মুফতীও এই কাজ করতে পারেন না। তাহলে যারা সোনালি যুগের মুফতী ও ফকীহ, যারা যুগশ্রেষ্ঠ, বরেণ্য ও স্বীকৃত, তারা কীভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারেন?!

ইমাম শাফেয়ী রহ. তো এমনও বলেছেন-

أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا رَوَيْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَقُلْتُ بِغَيْرِهِ.

'কোন ভূমি আমাকে বহন করবে, যদি আমি নবীজী থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করে তার বিপরীত ফতোয়া প্রদান করি?' তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা ১/৩৬১

একদিন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তাঁর শাগরেদ হুমাইদী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি এই হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দেন? তখন ইমাম শাফেয়ী রহ. রাগান্বিত হয়ে বলেন-

رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ مِنْ كَنِيْسَةٍ عَلَيَّ زُنَّارٌ، حَتّٰى إِذَا سَمِعْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا لَا أَقُوْلُ بِهِ.

'তুমি কি ভেবেছ, আমি পৈতা লাগিয়ে গির্জা থেকে বের হয়েছি, আমি নবীজীর কোনো হাদীস শুনব আর সে অনুযায়ী ফতোয়া দেব না?' প্রাগুক্ত

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন-

لَمْ يَزَلِ النَّاسُ فِيْ صَلَاحٍ مَا دَامَ فِيْهِمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيْثَ، فَإِذَا طَلَبُوْا بِلَاحَدِيْثٍ فَسَدُوْا.

'মানুষ ততদিন ভালো থাকবে, যতদিন তাদের মধ্যে হাদীসের চর্চা থাকবে। আর যখনই তাদের মধ্যে হাদীস চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই তারা নষ্ট হয়ে যাবে।' আলমীযানুল কুবরা ১/৫১
তিনি আরো বলেন-

إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِيْ دِيْنِ اللهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ.

'তোমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে মনগড়া কথা বলো না, তোমাদের জন্য আবশ্যক হল সুন্নাহর অনুসরণ করা। কেননা, যে সুন্নাহ থেকে বের হয়ে গেল, সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।' প্রাগুক্ত
ইমাম মালেক রহ. বলেন-

اَلسُّنَنُ سَفِيْنَةُ نُوْحٍ: مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.

'সুন্নাহ হল নূহ আলাইহিস সালামের কিশতী। যে তাতে চড়বে সে মুক্তি পাবে। আর যে তা থেকে দূরে থাকবে সে ডুবে যাবে।' -মিফতাহুল জান্নাহআসারুল হাদীসিশ শরীফ ২৬

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন-

مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلٰى شَفَا هَلَكَةٍ.

'যে নবীজীর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।' প্রাগুক্ত

এই হল হাদীসের ক্ষেত্রে ইমামগণের দৃষ্টিভঙ্গি।

যারা হাদীসের বিপরীত ফতোয়া দেওয়াকে কুফুরি ও ধ্বংস জ্ঞান করেন, তারা কি কখনো হাদীস বাদ দিতে পারেন?

বাকি, মানুষ বলতেই ভুল। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার ইমামের কারো ভুল হতে পারে। কোনো বিষয়ের কোনো হাদীস তাদের কারো জ্ঞানের পরিধিতে নাও আসতে পারে অথবা এলে তা ভুলেও যেতে পারেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, কেউ যদি দাবি করে, আমি নবীজীর সকল হাদীস জানি, তাহলে সে মিথ্যুক। আর কেউ যদি বলে, গোটা উম্মত থেকে নবীজীর কোনো একটি হাদীস হারিয়ে গেছে, তাহলে সেও মিথ্যুক।

এই হিসেবে তাদের দু-এক হাদীস জানা নাও থাকতে পারে।

মোটকথা, এটা বাস্তব ও সর্বসম্মত কথা যে, একজন ব্যক্তি নিজ শাস্ত্রে যতই বিদ্বান হোক না কেন, শাস্ত্রীয় কোনো তথ্য তার জানা নাও থাকতে পারে। সে হিসেবে চার ইমামেরও কোনো না কোনো হাদীস ছুটে যেতে পারে। এটা যে শুধু চার ইমামের বেলায় প্রযোজ্য তা নয়, বরং সাহাবীদের মধ্যে যত মুফতী ছিলেন এবং তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর মধ্যে যত মুফতী ছিলেন, সবার ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য।

তবে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, তাদের এই না-জানা বা ছুটে যাওয়া হাদীসের সংখ্যা কত?

একটি স্বাভাবিক কথা তো সবাই জানে এবং স্বীকার করে, একজন মানুষ তার নিজ শাস্ত্রে যত বেশি সময় দেবে, শাস্ত্র নিয়ে যত বেশি পড়াশোনা বা গবেষণা চালিয়ে যাবে, সে শাস্ত্রে তার অজানার সংখ্যা তত কমে আসবে। চার ইমাম যেমন সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুফতী ছিলেন, তেমনি তাঁরা হাদীসের ক্ষেত্রেও ইমাম ছিলেন। ছোটবেলা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হাদীস অন্বেষণ ও হাদীস বর্ণনা এবং সেগুলোর চর্চা করেই গেছেন।

হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে তারা স্ব স্ব যুগের নক্ষত্র। ইমাম মালেক রহ.-এর হাদীসের কিতাবকে তো সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসের কিতাব বলা হয়। ইমাম আহমদ রহ.-এর হাদীসের কিতাব 'মুসনাদে আহমদ' সবার কাছে প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর হাদীসের কিতাব 'কিতাবুল আছার' হাদীসের সর্বপ্রাচীন কিতাবসমূহের অন্যতম। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর হাদীসের কিতাব বর্তমানে মুদ্রিত।

ইতিহাসগ্রন্থে তাঁদের হাদীস চর্চার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আছেই। পাশাপাশি প্রত্যেকের সম্পর্কে অনেক স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচিত হয়েছে। তাই তাঁদের থেকে যদি হাদীস ছুটে যায় এবং তাঁরা যদি হাদীস না জানেন, তাহলে তা যে অতি সামান্য পরিমাণই হবে, তা সহজে অনুমেয়।

আগে আমরা জেনেছি, হযরত আবু বকর রা. আলী রা. উমর রা. প্রমুখ সাহাবী কোনো কোনো হাদীস জানতেন না। তাই বলে তাঁরা অনেক হাদীস জানতেন নাএমন ধারণা করাও পাপ ও অবান্তর। ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মুসলিম রহ. আবু দাউদ রহ. নাসায়ী রহ. প্রমুখের এ ধরনের কোনো কোনো হাদীস ছুটে যেতে পারে। তাই বলে তাঁদের বহু হাদীস ছুটে গেছে, বিষয়টি এমন নয়। বরং তা খুবই সামান্য। চার ইমামের বিষয়টিও ঠিক তাই।

অনেক সময় আগের যুগের কোনো বিষয় বা কারো অবস্থা সময়ের বেশি ব্যবধানের কারণে সহজে বুঝে আসে না। কিন্তু সেটি যদি বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে পর্যালোচনা করা হয়, তখন তা সহজে বুঝে আসে। তাই বর্তমানের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি খোলাসা করছি।

শায়েখ বিন বায রহ. সৌদি আরবের প্রধান মুফতী ছিলেন, যেমন শায়েখ নাসের আলবানী রহ.ও তার মতাদর্শের প্রধান মুফতী ছিলেন। তো তারা ফতোয়া দিলে সহীহ হাদীসের আলোকেই দেবেন। সহীহ হাদীসের বিপরীত দেবেন না। তাহলে চার ইমামসহ সাহাবী-তাবেয়ীদের সময়কার মুজতাহিদ যারা ছিলেন, তারা কীভাবে সহীহ হাদীসের বিপরীত ফতোয়া দিতে পারেন?

চার ইমামসহ এসব মুফতী মহোদয় শায়েখ বিন বায ও শায়েখ আলবানী থেকে তাকওয়া, পরহেযগারি, দ্বীনপালন, খোদাভীতি, শরীয়তের দর্শন, কুরআন হাদীসের জ্ঞানসহ সর্ববিষয়ে বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন।

শায়েখ বিন বায ও শায়েখ আলবানীও যেহেতু মানুষ, তাই তাদেরও কোনো কোনো হাদীস ছুটে যেতে পারে, তাদের জানা নাও থাকতে পারে; কিন্তু তাদের মতাদর্শের কেউ এমন ভাবে না যে, তাদের বহু হাদীস অজানা ছিল। বরং তাদের সবাই মানে যে, এই দুইজন সব হাদীসই জানেন। তবে মানুষ হিসেবে এক-দুটি নাও জানতে পারেন। তো শায়েখ বিন বায ও শায়েখ আলবানী থেকে যদি 'মানুষ হিসেবে'

ছাড়া কোনো হাদীস না ছুটে, তাহলে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা, আহমদ রহ. থেকে কীভাবে বহু হাদীস ছুটবে? অথচ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, তাকওয়া, তাফাক্কুহ প্রভৃতি বিষয়ে চার ইমামের সঙ্গে বর্তমানের কারো তুলনাই চলে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন, আমীন।

যাই হোক, চার ইমাম হাদীসের বিপরীতে ফতোয়া দিতে পারেন না। বাকি, কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট হাদীসটি তাঁদের জানা না থাকে, তখন হয়ত এই না জানার কারণে তাঁদের ফতোয়া হাদীসের বিপরীতে হয়ে যায়। তবে এমন না জানার সংখ্যা নিতান্তই কম, যা আগে বলা হয়েছে। এরপরও তাঁরা এসব সম্পর্কে বলে গেছেন, যদি আমাদের ফতোয়ার বিপরীতে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের ফতোয়া বাতিল এবং হাদীসই আমাদের ফতোয়া ও মাযহাব।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এক স্থানে বলেন-

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ وَقُلْتُ قَوْلًا، فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْ قَوْلِي وَقَائِلٌ بِذٰلِكَ.

‘আমি যদি এমন কোনো ফতোয়া দিয়ে থাকি, যার বিপরীতে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই আমার ফতোয়া এবং আমি আগের ফতোয়া ফিরিয়ে নিলাম।’

এটি যে শুধু ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয়, বরং চার ইমামসহ অন্যান্য মুফতী সবার একই দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর এই বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন-

فَهٰذَا مِنْ سِيَادَتِهِ، وَهٰذَا نَفْسُ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

'এটা তাঁর বড়ত্ব ও আমানতদারির প্রমাণ। একই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য ইমামেরও। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবাইকে রহম করুন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আমীন।' তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারার ২৮৩ নং আয়াতের অধীন

আর এই বিষয়টিকেই অন্য শব্দে এভাবে বলা হয়-

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ.

'হাদীস যদি সহীহ হয়, তাহলে সেটিই আমার মাযহাব।'

আবার অনেক সময় এমন হয়, একটি বিষয়ে ইমাম বহু অনুসন্ধান করেও কোনো হাদীস পাননি। তাই তিনি অন্যান্য মূলনীতির ভিত্তিতে অথবা নিতান্তই দুর্বল কোনো বর্ণনার ভিত্তিতে একটি মত প্রকাশ করেন। তখনো তিনি বলেন, এক্ষেত্রে যদি কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই আমার মাযহাব।

এই হল উল্লিখিত উক্তির প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ ইমামগণ প্রায় সব হাদীসই জানেন, তবে 'মানুষ হিসেবে' তাদের কিছু হাদীস ছুটে যেতে পারে। আর সেসব ক্ষেত্রে যদি ইমামগণ এমন ফতোয়া প্রদান করেন, যা এসব হাদীসের পরিপন্থী, তাহলে ফতোয়া হবে সহীহ হাদীসই এবং সেটিই তাঁদের মাযহাব।

ইমামের অনুসন্ধান অনেক নিখুঁত। তাঁর কুরআন হাদীস জানাশোনাও সুবিস্তৃত। তারপরও কোনো মাসআলায় সব খুঁজেও যদি কোনো হাদীস না পান, কিন্তু তাঁর কামনা যেন কোনো হাদীস পাওয়া যায়; তখনই তিনি তাঁর শাগরেদদের বলেন, আপাতত এই মাসআলায় আমার মত এই। বাকি, যদি এতে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই হবে আমার মাযহাব। আর প্রত্যেক ইমামের শাগরেদরা ইমামের এই উপদেশের ওপর আমলও করেছেন, যেখানে ইমামের হাদীস ছুটে গিয়েছে এবং যেখানে ইমাম অনেক তালাশের পরও

কোনো হাদীস পাননি কিন্তু শাগরেদরা পেয়েছেন, সেখানে তারা সে হাদীস অনুযায়ীই ফতোয়া দিয়েছেন এবং সেসব ক্ষেত্রে ইমামের মত বাদ দিয়ে হাদীস অনুসারেই মাযহাব স্থির করেছেন এবং সেটিই মাযহাব হিসেবে পরবর্তী সবাই গ্রহণ করেছেন।

এই প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায়, এ ধরনের ফতোয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং এগুলো প্রসিদ্ধ মাসআলার ক্ষেত্রে নয়। কেননা, প্রসিদ্ধ মাসআলা-গুলোতে সংশ্লিষ্ট সহীহ হাদীস তাঁদের মতো ব্যক্তিত্বের অজানা থাকার নয়। সেগুলোতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট সকল সহীহ হাদীস জেনেই এবং সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করেই ফতোয়া প্রদান করেছেন।

কিন্তু, আমাদের কিছু ভাই ইমামগণের ক্ষেত্রে উক্তিটি এমনভাবে পেশ করে থাকেন, মনে হয় যেন ইমামগণ প্রায় মাসআলায় সহীহ হাদীসের বিপরীত ফতোয়া দিয়েছেন। এমনকি মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া, আমীন বলা, রাফয়ে ইয়াদাইন ইত্যাদি মাসআলায়ও হাদীসের বিপরীত ফতোয়া দিয়েছেন। যদি বিষয়টি এমনই হয়, তাহলে ইমামগণ মুফতী হওয়ারই যোগ্য হবেন না। কারণ, যারা বহু মাসআলায় হাদীসের বিপরীত ফতোয়া দেন, তাদের তো ফতোয়া দেওয়ার কোনো অধিকার থাকে না। আর যারা এসব বড় বড় প্রসিদ্ধ মাসআলায়ও হাদীস জানেন না, তারা অন্যান্য খুঁটিনাটি মাসআলায় হাদীস জানবেন কী করে? তা ছাড়া তারা হাদীস শাস্ত্রের নক্ষত্রতুল্য হলেন কী করে? পুরো জীবন তারা হাদীস চর্চা করেছেন এমন কথা সত্য হয় কীভাবে? সর্বোপরি এ ধরনের ব্যক্তিগণ জগৎশ্রেষ্ঠ ও যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হন কীভাবে?

যেসব ভাই ইমামদের ক্ষেত্রে উক্তিটি বেশি আওড়ে থাকেন, তাদের যারা শায়েখ আছেন, তাদেরও তো একই কথা, সহীহ হাদীসই তাদের মাযহাব। তারাও তো বলেন, আমার কোনো ফতোয়া সহীহ হাদীসের বিপরীত পেলে তা দেয়ালে ছুড়ে ফেলবে এবং হাদীস অনুযায়ী আমল করবে। এসব ভাই কি তাদের শায়েখদের ক্ষেত্রে ভাবতে পারেন,

তারা অনেক গবেষণায় ভুল করেছেন এবং সহীহ হাদীসের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছেন? বড় বড় প্রসিদ্ধ যেসব মাসআলা আছে তাতে শায়েখগণ সহীহ হাদীস না-জানার কারণে হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া দিয়েছেন? ইমামগণের ফতোয়ার মতো শায়েখদের ফতোয়াগুলোও ঠিক করতে হবে। নাকি তাদের শায়েখদের বেলায় তাদের বিশ্বাস, ইমামদের ভুল হয়েছে এবং তার সংখ্যাও অনেক; কিন্তু আমাদের শায়েখদের একটি মাসআলাতেও হাদীসের বিপরীত ফতোয়া হয়নি। তাহলে বলতে হবে, তাদের এসব শায়েখ ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকেও বড়! কুরআন হাদীস ও ফতোয়াবিদ্যায় তাদের থেকে বহুগুণ বড়!

আমরাও বলি এবং দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলি, আমাদের গন্তব্য জান্নাত। জান্নাতের রাস্তা সেটিই যা আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। অন্য কোনো রাস্তায় জান্নাত পাওয়া যাবে না। তাই কোনো ইমামের ভুল আঁকড়ে ধরে নিজেদেরকে জান্নাত থেকে হটিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। আমাদের কাছে জান্নাত বড়, ইমাম নয়। তাই ইমামের ভুল বিনাবাক্যে পরিত্যাজ্য। সহীহ হাদীসই সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। মানুষ তো সব সময় সঠিকটিই তালাশ করে। তাই আমরা সহীহটি বাদ দিয়ে অন্যটি ধরতে যাব কেন? আমরা একমাত্র সহীহটিই গ্রহণ করি

আমরাও বলি, হাদীস সহীহ হলে সেটিই ইমামের মাযহাব। তবে এর অর্থ এই নয়, যে কেউ তাদের যেকোনো ফতোয়ার ক্ষেত্রে এই দাবি করে বসবে, 'এই ফতোয়া ভুল। এর বিপরীতে সহীহ হাদীস আছে। আর ইমাম নিজেও বলেছে, যে হাদীস সহীহ সেটিই তার মাযহাব। তাই তার আগের ফতোয়া বাদ দিয়ে হাদীসই গ্রহণ করতে হবে।' আর আমরা তা বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নেব। বরং তাকে প্রমাণ করতে হবে, ইমামের ফতোয়ার বাস্তবে কোনো দলিলই নেই। আর যে হাদীসটি তাদের ফতোয়ার বিপরীত তা সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। কিন্তু যদি ইমামের ফতোয়ার বাস্তবেই প্রমাণ থাকে অথবা যেসব প্রমাণ আছে, হয়ত সেগুলো এই ব্যক্তির নিজস্ব ধারার গবেষণামতে

দুর্বল, কিন্তু বাস্তবে সবল, তাহলে তার গবেষণার বিপরীত হওয়ার কারণেই সে এটিকে ভুল বলছে, এরূপ হলে তা আমরা মেনে নেব না। তাই এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

এক. তিনি যে সহীহ হাদীস পেশ করেছেন, তা বাস্তবে সহীহ কি না? অনেক সময় দেখা যায়, শাস্ত্রীয় বিচারে এবং হাদীস বিশারদদের বক্তব্য হিসেবে যয়ীফ হাদীসকে সহীহ হিসেবে দেখানো হয় এবং ইমামদের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

দুই. হাদীসটি সহীহ হলেও ইমাম যে ফতোয়া দিয়েছেন, তার স্বপক্ষেও কোনো সহীহ হাদীস কিংবা ইজমায়ে সাহাবা আছে কি না?

অনেক সময় দেখা যায়, একটি বিষয়ে দুইটি সহীহ হাদীস থাকে, যার একটি বিষয়টিকে একভাবে করতে বলে, আরেকটি অন্যভাবে। ইমাম বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে দুই হাদীসের একটি গ্রহণ করেন। কিন্তু আরেকজন অপরটি গ্রহণ করেন। সে 'আরেকজন' যদি তার গৃহীত হাদীস পেশ করে ইমামের ওপর অভিযোগ তোলে যে, আপনি সহীহ হাদীসের বিপরীতে কথা বলেছেন।

এই অভিযোগ ভুল। কেননা, ইমামের স্বপক্ষেও এখানে সহীহ হাদীস রয়েছে।

আবার অনেক সময় সহীহ হাদীস না থাকলেও ইমামদের স্বপক্ষে সাহাবীদের ঐকমত্য থাকে। তখন ইমাম যৌক্তিক কারণেই এই হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া না দিয়ে ইজমা অনুযায়ী ফতোয়া দেন। এক্ষেত্রে কেউ যদি ওই হাদীসটি দেখিয়ে বলে, ইমাম বলেছেন, সহীহ হাদীসই তার মাযহাব। সুতরাং এই হাদীস অনুযায়ী আমল করুন। তাহলে এটিও হবে ভুল।

তিন. একটি মাসআলা নিয়ে যেমন উলামায়ে কেরামের মাঝে ইখতেলাফ তথা মতভিন্নতা হয়, তেমনি একটি হাদীস সহীহ নাকি যয়ীফ, এ নিয়েও মুহাদ্দিসগণের মাঝে ইখতেলাফ হয়। এক মুহাদ্দিসের কাছে হাদীসটি সহীহ আরেকজনের কাছে যয়ীফ। তো যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা ওই ইমামের কাছেও সহীহ হতে হবে। অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদদের সামগ্রিক ঐকমত্য থাকতে হবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ কেউ করেন কি, একটি হাদীস এক আলেমের কাছে যয়ীফ এবং তার পক্ষে যুক্তিও আছে, কিন্তু ওই ভাই অন্য আলেমের মত অনুসারে তাকে সহীহ মনে করেন। এই ভাই ওই আলেমের কাছে গিয়ে বলেন, আপনি তো সহীহ হাদীস মানেন, তাই না? দেখুন, এই হাদীস সহীহ, তাই আপনাকে এর ওপর আমল করতে হবে।

এরূপ আচরণ করা ভুল। কারণ, এই হাদীস এই ভাইয়ের ধারণা মতে সহীহ হলেও ওই আলেমের কাছে সহীহ নয়, বরং যয়ীফ। তাই ওই আলেমকে যদি এই হাদীসের ওপর আমল করতে বলা হয়, তাহলে তাকে যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করতে বলা হল।

উদাহরণস্বরূপ, একটি হাদীস শায়েখ বিন বাযের কাছে সহীহ, কিন্তু শায়েখ নাসের আলবানীর কাছে যয়ীফ। তাহলে শায়েখ বিন বায কি নাসের আলবানীকে বলতে পারবেন, আপনাকে এ হাদীসের ওপর আমল করতে হবে। কেননা এটি সহীহ। এটা যেমন আলবানীর ক্ষেত্রে করা ভুল, তেমনি ইমামদের ক্ষেত্রেও তা করা ভুল।

এই তিনটি স্তর পার করার পর যদি দেখা যায়, ইমামের স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই; না কুরআন, না হাদীস, না সাহাবীদের ইজমা; আর এর বিপরীতে যে হাদীসগুলো উত্থাপন করা হয়েছে তা সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ, তখন গিয়ে ইমামের ফতোয়াকে ভুল সাব্যস্ত করা হবে এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং এ হাদীসকে ইমামের

মাযহাব বলা হবে। এ ছাড়া ইমামের ফতোয়াকে ভুল বলার এবং এ হাদীসকে তার মাযহাব বলার কোনো পথ বা সুযোগ নেই।

কিন্তু হয় কি, আজ যারা এই উক্তিটি করে বেড়ান এবং ইমামের যেসব ফতোয়ার বিপরীতে 'সহীহ'(?) হাদীস উত্থাপন করে থাকেন, সেগুলোর সবই এমন যে, ইমামের ফতোয়ার স্বপক্ষেও বাস্তবসম্মত প্রমাণ আছে বা ইমাম যেসব হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রদান করেছেন সেগুলোও সহীহ। বাকি, অপর ব্যক্তি শুধু তার নিজস্ব পদ্ধতির গবেষণায় সেগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে ইমামের ফতোয়াকে ভুল আখ্যা দেয় অথবা তিনি ইমামের ফতোয়ার বিপরীতে যে হাদীস পেশ করেছেন, তা বাস্তবে সহীহ নয়। এসব ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার কারণে কত লোককে যে তারা গোমরাহ বলছেন তার কোনো হিসাব নেই।

মুনাসিব মনে হচ্ছে, আমাদের যে ভাইয়েরা উল্লিখিত দুটি সূত্র (অর্থাৎ ইমামের ভুল হলে সেখানে ইমামের ভুলের ওপর অটল থাকা বৈধ নয় এবং সহীহ হাদীসই ইমামের মাযহাব, তা না মানা বৈধ নয়) ধরে মাযহাব অনুসারীদের যেভাবে মুশরিক বলেন তার কিছু নমুনা নিয়ে আলোচনা করব। যেন বিষয়টি একটু খোলাসা হয়। আর এক্ষেত্রে অপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম মাসআলায় না গিয়ে প্রসিদ্ধ মাসআলা দিয়েই আলোচনা করব।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

সূরা আরাফ ২০৪

ইমাম আহমদ রহ. বলেন-

أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ.

'সকল আলেম একমত যে, আয়াতটি নামাযের কেরাত প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।' মাসায়িলু আহমাদ লি-আবী দাউদ ৪৮

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন-

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا.

'যখন ইমাম কেরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।' মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৫, সহীহ মুসলিম ৪০৪, হাদীসটি সহীহ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন-

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

'নামাযে কাউকে ইমাম বানানো হয় তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন কেরাত পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।' সুনানে নাসায়ী,

হাদীস ৯২২, মুসনাদে আহমদ ২/৩৭৬, হাদীসটি সহীহ

নবীজী বলেন-

كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ.

'যে ব্যক্তির ইমাম আছে, তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত বলে গণ্য হবে।' মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩৮২৩, ইমাম বুসীরী রহ. বলেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের সহীহ হাদীসের মানের মতো।

নবীজী বলেন-

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

'যে সূরায়ে ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না।' সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৪

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ.

'যে ব্যক্তি কোনো নামায পড়ল এবং তাতে সূরায়ে ফাতেহা পড়ল না তার সে নামায অসম্পূর্ণ (বাতিল নয়)।' সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৫

আপাতত এখানে এই ছয়টি নস (পাঠ) উদ্ধৃত করা হল। একটি আয়াত পাঁচটি হাদীস। হাদীস সবগুলোই সহীহ। তৃতীয় হাদীসটি নিয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলেও তা সঠিক নয়। তারপরও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এর আগের দুই হাদীস একই অর্থের এবং দুইটিই সহীহ। মুক্তাদীর কেরাতের বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা আছে। সবগুলো উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

তো আমাদের ওই ভাইয়েরা এ ছয়টি দলিল থেকে শুধু পঞ্চমটি (অর্থাৎ যে সূরা ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না) নিয়ে বাকিগুলো বাদ দিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইমামের গ্রহণীয় দলিলসমূহের প্রতি আপত্তি তোলে যে, তারা সহীহ হাদীসের বিপরীত কথা বলেছেন, তাদের ভুল হয়েছে আর তারা নিজেরাও বলে গিয়েছেন সহীহ হাদীসই তাদের মাযহাব। সুতরাং তাদের সে মত পরিত্যাগ করে এ হাদীসের মতে আসতে হবে, আসতেই হবে।

এবার আমরা একটু ভাবি, ইমামের মতকে ভুল তখন বলা যায়, যখন তার কোনো দলিল না থাকে। মুক্তাদী কেরাত পড়বে নাএই মতের স্বপক্ষে আরো পাঁচটি দলিল আছে। একটি কুরআন মাজীদের আয়াত আর বাকিগুলো সহীহ হাদীস। কোনো মাসআলায় যদি যয়ীফ দলিলও থাকে, তাহলে তো কাউকে অকাট্যভাবে ভুল বলা যায় না। আর সেখানে যদি পাঁচ-পাঁচটি সহীহ দলিল থাকে, তাহলে তাকে ভুল বলা কীভাবে সম্ভব?

শুধু চার ইমাম কেন সহীহ হাদীস যেকোনো মুসলমানের মাযহাব। একটি বিষয়ে পাঁচ-ছয়টি আয়াত ও হাদীস থাকলে সে ক্ষেত্রে শুধু একটি সহীহ হাদীস গ্রহণ করাই কি সহীহ হাদীস মানা? ইমামকে অবশ্যই নিজের মত ত্যাগ করে সহীহ হাদীস মানতে হবে। তাই বলে কি আরো পাঁচটি আয়াত ও হাদীসকে ত্যাগ করে?

আরেকটি কথা হল, তারা لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটির অর্থ করে, যে নামাযে সূরায়ে ফাতেহা পড়ল না তার নামায বাতিল। অথচ হাদীসটিতে বাতিল শব্দ নেই। এই হাদীসের শাব্দিক অর্থ হল, যে সূরায়ে ফাতেহা পড়ল না তার জন্য কোনো নামাযই নেই।

অনেক সময় একটি বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে এভাবে বলা হয়। অর্থাৎ এটি না করলে কেমন যেন মূল কাজটিই করল না। উদ্দেশ্য হল বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো, তা না করলে যে মূল কাজটিই হবে না এমন বলা উদ্দেশ্য নয়। যেমন, অন্য হাদীসে আছে-

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

'যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই। যার ওয়াদা নেই তার দ্বীন নেই।' মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৩৮২

এর অর্থ এই নয় যে খেয়ানতকারী কাফের দ্বীন বহির্ভূত।

মূলত আমানতদারি ও ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই এমনভাবে বলা হয়েছে। যেন এই দুই জিনিস বিলুপ্ত হয়ে গেলে তার থেকে দ্বীন-ঈমানই বিলুপ্ত হয়ে গেল। ঠিক তেমনিভাবে ওই হাদীসের অর্থ, নামাযে সূরায়ে ফাতেহার গুরুত্ব বোঝানো। সূরায়ে ফাতেহা না পড়লে কেমন যেন নামাযই হয় না। তবে মূল নামায বাতিল হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর প্রমাণ উক্ত হাদীসটিই। ওই হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতেহা পড়ল না তার নামায অসম্পূর্ণ। এই হাদীসের আরেক বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে, তার নামায অসম্পূর্ণ।

কী বিচিত্র! ছয়-সাতটি আয়াত ও হাদীস থেকে শুধু একটি গ্রহণ করে। আবার এর এমন একটি অর্থ করে, যার কোনো দলিল হাদীসে নেই। আর এটা দিয়ে কত ইমামকে ভুল বলে দেয়, একে সহীহ হাদীস বলে সোনালি যুগের ইমামদেরকে এটা মানতে বাধ্য করে এবং অন্য ভাইদেরকে এটা না মানার কারণে মুশরিক বলে। এই হল তাদের ইমামের ভুল ধরার হাল-হাকীকত।

চরমপন্থীদের ইমাম ও মাযহাবের বিরুদ্ধে যত পুঁজি আছে, সূরা ফাতেহার মাসআলা সম্ভবত তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পুঁজি। এই মাসআলা দিয়ে যে কত ঈমানদারকে কাফের বলা হয়, তার কোনো হিসাব নেই! আর এই মাসআলায় তাদের মুশরিক বলার চিত্র হল এই। এবার বাকিগুলোর অবস্থা কী হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

তাকবীরে তাহরীমার পর নামাযের প্রথম আমল হল হাত বাঁধা। তবে কোথায় বাঁধবে এ নিয়ে সাহাবী তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর যুগ থেকে দুটি ধারা চলে এসেছে কেউ নাভির নিচে হাত বাঁধতেন, কেউ নাভির ওপরে। কিন্তু বুকের ওপর কেউ বাঁধতেন না।

ইমাম তিরমিযী রহ. ‘বাম হাতের কব্জির ওপর ডান হাতের কব্জি রাখা প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন-

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأٰى
بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأٰى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.

‘সাহাবী তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের আমল ছিল এই হাদীস অনুযায়ী। তাদের মত ছিল নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখবে। তাদের কারো মত নাভির ওপরে রাখবে, কারো মত নাভির নিচে রাখবে। তাদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটিরই অবকাশ আছে।’ জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫২

সুতরাং সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী থেকে দুই আমলই চলে এসেছে হয়ত নাভির নিচে হাত বাঁধবে, না হয় নাভির ওপরে। বুকের ওপর বাঁধার কোনো আমল তাদের কাছে ছিল না। এই দুই ধারা অনুসারে ইমামদের মাযহাব প্রচলিত।

কিন্তু আমরা যে আমলটি সমগ্র সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর ধারায় পেয়েছি, এই ভাইয়েরা বলেন তা নাকি ভুল। আর সেগুলো গ্রহণ করে ইমামগণও নাকি ভুল করেছেন। কেননা, আমলটি সহীহ হাদীসের বিপরীত। আর ইমামগণ বলে গিয়েছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটি তার মাযহাব। সুতরাং যারা ইমামের অনুসারী তাদের এই

মাযহাবই অনুসরণ করতে হবে। আগেরটি আঁকড়ে ধরে থাকলে শিরক হবে।

তাদের এই দাবির দালিলিক পর্যালোচনার আগে অতি সাধারণ বিবেচনায় যে প্রশ্নগুলো আসে তা হল, গোটা সাহাবী ও তাবেয়ী প্রজন্ম যে আমলটি করে আসছেন, তা ভুল হয় কীভাবে?

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রথম দুই প্রজন্ম কীভাবে নামাযের প্রথম আমলটিতে ভুল করে আসছেন। আচ্ছা, নবীজীর সঙ্গে নামায কারা পড়েছেন এবং তাঁর নামায পড়ার পদ্ধতি কারা পর্যবেক্ষণ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম নাকি আমাদের ওই ভাইয়েরা!

আচ্ছা, সহীহ হাদীস মানার স্পৃহা কাদের বেশি, সাহাবায়ে কেরামের নাকি আমাদের এসব ভাইয়ের?

কোন হাদীসটি সহীহ, কোনটি সহীহ নয়, কোনটি শরীয়ত কোনটি শরীয়ত নয়এ সম্পর্কে কারা বেশি জানতেন? সাহাবী তাবেয়ী নাকি ওই ভাইয়েরা?

আচ্ছা, সহীহ হাদীসে যদি বুকের ওপর হাত বাঁধার কথা থাকে, তাহলে এসব সহীহ হাদীস সোনালি যুগে কোথায় ছিল? সাহাবী তাবেয়ী কেউ সেগুলো জানলেন নাএ প্রশ্নগুলো অতি সাধারণ এবং মৌলিক প্রশ্ন। এগুলোর সমাধান ছাড়া বুকের ওপর হাত বাঁধার অবকাশ নেই।

এবার ওই ভাইয়েরা এ ধারাটির বিপরীতে যেসব 'সহীহ'(?) হাদীস পেশ করেন সেগুলো একটু পর্যালোচনা করে দেখি।

আমাদের ওই ভাইয়েরা এ ক্ষেত্রে যেসব হাদীস পেশ করেন তা এই-

এক.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى صَدْرِهِ.

'ওয়ায়েল ইবনে হুজর রহ. বলেন, আমি নবীজীর সঙ্গে নামায পড়েছি। তিনি বুকের ওপর ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখেন।' সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৪৭৯

এ মাসআলায় তারা যেসব হাদীস পেশ করে থাকেন এ হাদীসটি হল তাদের কাছে সর্বাধিক সহীহ। আর যেহেতু বর্ণনাটি সহীহ ইবনে খুযাইমাতে আছে, তাই স্থূলভাবে তারা ধারণা করে থাকে বর্ণনাটি সহীহ। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের এ কথা স্বীকৃত যে, সহীহ ইবনে খুযাইমায় কিছু যয়ীফও আছে। একথা খোদ ইবনে খুযাইমা রহ.-এর বিভিন্ন বক্তব্য থেকেও বুঝে আসে। হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের মাধ্যম হল সনদ। আর জানা কথা, হাদীসটি শায্ তথা ভুল ও বিচ্ছিন্ন। কেননা ওয়ায়েল রা.-এর সূত্রে হাদীসটি যতজনে বর্ণনা করে, কেউই 'বুকের ওপর' শব্দটি বলেননি। শুধু মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন।

আর মুয়াম্মাল হলেন দুর্বল রাবী। বিশেষভাবে যখন সুফিয়ান ছাওরী রহ. থেকে বর্ণনা করেন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. তার ব্যাপারে বলেন صَدُوْقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ 'সত্যবাদী ঠিক, তবে স্মরণশক্তি দুর্বল।' তাকরীবুত তাহযীব

এ ধরনের কোনো বর্ণনাকারী সবার বিপরীতে একা কোনো কিছু বর্ণনা করলে তা হাদীস বিশারদদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. সাহাবী হুলব আত্তায়ী রা. থেকে বর্ণিত-

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ هٰذِهٖ عَلٰى صَدْرِهٖ، وَصَفَ يَحْيٰى: اَلْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَوْقَ الْمَفْصِلِ.

'আমি নবীজীকে দেখলাম, একে বুকের ওপর রাখতে। ইয়াহ্ইয়া (ইবনে সাঈদ আলকাত্তান) এর বিবরণ দিয়েছেন ডান হাত বাম হাতের কব্জির ওপর।

এই হাদীসটি বর্ণনা করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁর মুসনাদে। তিনি তা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া সুফিয়ান ছাওরী রহ. থেকে, তিনি সিমাক ইবনে হাঁব থেকে, তিনি কাবীসা ইবনে হুলব থেকে, তিনি তার পিতা হুলব থেকে।

বর্তমান আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ হাদীস গবেষক, মুসনাদে আহমদ-এর টীকাকার শায়েখ শুআইব আরনাউত বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখেন-

> هٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لِجَهَالَةِ قَبِيْصَةَ.
>
> 'এই বর্ণনার সনদটি দুর্বল। কেননা, কাবীসা মাজহূল তথা তিনি বিশ্বস্ত না অবিশ্বস্ত, তা অজ্ঞাত।' মুসনাদে আহমদ ৫/২২৬

ইজলী এবং ইবনে হিব্বান রহ. কাবীসাকে ছিকা বললেও ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম নাসায়ী রহ. তাকে মাজহূল বলেন। (দেখুন, তাহযীবুল কামাল) মাজহূল ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্ভবত এজন্যই ইমাম আহমদ রহ. এ শব্দটি বর্ণনা করার পরও সে অনুযায়ী আমল করেননি। বরং তিনি বুকের ওপর হাত বাঁধাকে মাকরূহ বলেছেন।

বুকের ওপর হাত বাঁধার ক্ষেত্রে এই দুই হাদীস হল তাদের কাছে সবচেয়ে সহীহ(?) হাদীস। আর এগুলোর অবস্থা হল এই! এই হল তাদের সহীহ হাদীসের অবস্থা। এ ধরনের যয়ীফ ও বিচ্ছিন্ন বর্ণনাকে সহীহ বানিয়ে ইমামদেরকে ভুল বলা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের নামাযকে হাদীস পরিপন্থী বলা হচ্ছে। অথচ এসব মুসলমান যে আমলটি করছে, তা সাহাবী তাবেয়ী থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত। ওই সাহাবী তাবেয়ী যুগের মুফতীগণের ফতোয়া ও আমলে বুকের ওপর হাত বাঁধার কথা কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত নেই। কী বিচিত্র! সোনালি যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি কাজকে একমাত্র সুন্নত বানিয়ে হাজার হাজার সাহাবী তাবেয়ীর আমলকে সুন্নত পরিপন্থী বানানো এবং তার জন্য অগ্রহণযোগ্য বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েতকে সহীহ বানিয়ে সকল ইমামের ভুল ধরা এবং সবার ওপর তা চাপিয়ে দেওয়াই কি সহীহ হাদীসের দাওয়াত?

এই মাসআলায় ইমামগণের স্বপক্ষে যেমন সকল সাহাবী তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ীর ইজমা ও আমল রয়েছে, তেমনি সরাসরি হাদীসও রয়েছে। সে হাদীস ওই ভাইদের পেশকৃত হাদীস থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নিচে রাখতে দেখেছি। মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস ৩৯৫৯

কাসেম ইবনে কুতলূবুগা রহ. আবুত তাইয়িব রহ. ও আল্লামা আবেদ সিন্ধী রহ. হাদীসটিকে মজবুত ও শক্তিশালী বলেছেন।

এই হল ওই ভাইদের সহীহ হাদীস পেশ করার চিত্র, যা আমরা মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার আলোচনায় দেখেছি। তারা সেখানে একটিমাত্র সহীহ হাদীস পেশ করে দিয়ে বলেন, ইমামদের হাদীস অনুযায়ী আমল করা জরুরি। কেননা তারা বলেছেন, সহীহ হাদীসই তাদের মাযহাব। অথচ ইমাম আবু হানীফা রহ. সেক্ষেত্রে আরো চার-পাঁচটি হাদীসের ওপর আমল করেন। কুরআনের আয়াত তো

শক্তিশালী। সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নিচে রাখতে দেখেছি। মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস ৩৯৫৯

কাসেম ইবনে কুতলূবুগা রহ. আবুত তাইয়িব রহ. ও আল্লামা আবেদ সিন্ধী রহ. হাদীসটিকে মজবুত ও শক্তিশালী বলেছেন।

এই হল ওই ভাইদের সহীহ হাদীস পেশ করার চিত্র, যা আমরা মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার আলোচনায় দেখেছি। তারা সেখানে একটিমাত্র সহীহ হাদীস পেশ করে দিয়ে বলেন, ইমামদের হাদীস অনুযায়ী আমল করা জরুরি। কেননা তারা বলেছেন, সহীহ হাদীসই তাদের মাযহাব। অথচ ইমাম আবু হানীফা রহ. সেক্ষেত্রে আরো চার-পাঁচটি হাদীসের ওপর আমল করেন। কুরআনের আয়াত তো আছেই। আর হাত বাঁধার মাসআলায় দেখলাম, তারা যে সহীহ হাদীস পেশ করে ইমামদেরও মানতে বাধ্য করে, তা সহীহ নয়। পাশাপাশি ইমামদের সঙ্গে সমগ্র সাহাবী তাবেয়ীর ইজমা রয়েছে এবং শক্তিশালী হাদীসও রয়েছে।

আমরাও বলি, ইমামগণ সহীহ হাদীসই মানেন। তাদের ফতোয়ার বিপরীত যদি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হল, তাদের স্বপক্ষে কোনো আয়াত বা হাদীস না থাকতে হবে বা ইজমায়ে উম্মত তথা কোনো শক্তিশালী দলিল না থাকতে হবে। যদি থাকে তখন তাদের ওপর সে হাদীসটি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি যে হাদীসটি পেশ করা হবে, তা সহীহ হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত হতে হবে। আমাদের ওই ভাইয়েরা যেসব মাসআলায় ইমামদের কথার বিপরীতে যেসব হাদীস পেশ করেন, তার সবগুলোর হয়ত হাদীসটিই সহীহ নয় অথবা ইমামদেরও মজবুত ও শক্তিশালী দলিল আছে। সুতরাং হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাবএই বাক্যটি এখানে প্রয়োগ করাই ভুল। তার প্রয়োগক্ষেত্র শুধু দুই জায়গা, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা নম্বর ৯৫-৯৮)

কেউ কেউ আবার এভাবে বলে থাকেন, আমরা তাকলীদ করি না, হাদীস মানি। আমরা মাযহাব মানি না, হাদীস মানি। আর অন্যরা মাযহাব মানে এবং তাকলীদ করে।

এসব ভাইয়ের কথার অর্থ দাঁড়ায়, তাকলীদ ও মাযহাব হাদীস থেকে ভিন্ন কোনো কিছু। তিনি তাকলীদও করেন না এবং মাযহাবও মানেন না। আর যারা তাকলীদ করে, মাযহাব মানে তারা হাদীস মানে না। বরং ভিন্ন কিছু মানে। এ হল একেবারে অসার কথা। এসব কথা এমন লোকেরা বলে, যারা না বুঝে হাদীস অনুসরণের অর্থ, না বুঝে মাযহাব মানার অর্থ। তারা এও জানে না যে, তাকলীদ কাকে বলে। আর ইজতেহাদের অর্থ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকার তো প্রশ্নই আসে না। এই অজ্ঞতার কারণেই তাদের এ ধরনের ঠুনকো কথা।

আগে তাকলীদ-সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা আল্লামা ইবনে আব্দুল বার, শায়েখ বিন বায, শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ. প্রমুখের বক্তব্য পেশ করেছি। সেখানে তারা এ কথাই বলেছেন, যার কুরআন হাদীস ও ইজতেহাদ-সংক্রান্ত সকল যোগ্যতা আছে, সে নিজেই তার মাসআলার সমাধান বের করবে এবং সে মোতাবেক আমল করবে। আর যার এমন যোগ্যতা নেই, সে ব্যক্তি যার উক্ত যোগ্যতা আছে তার তাকলীদ করবে। অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞেস করে মাসআলা জেনে নেবে। কারণ, এ ছাড়া সঠিক মাসআলা জানার আর কোনো সঠিক উপায় নেই।

হ্যাঁ, আরো কিছু ভুল পন্থা রয়েছে, যা অবলম্বন করা হারাম। যেমন কারো তাহকীকের যোগ্যতাও নেই আবার যোগ্য কারো কাছে না গিয়ে নিজেই গবেষণা করা। এই পন্থা, শরীয়ত তো বটেই, সকল বিবেকবান এবং যেকোনো রাষ্ট্রীয় আইনে যে কঠোর দ-নীয় অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরো একটি পন্থা হল, যোগ্যতা না থাকার কারণে নিজেও গবেষণা করল না আবার অন্য কোনো যোগ্যকেও জিজ্ঞেস করল না, বরং চুপচাপ থেকে গেল। জানা কথা,

শরীয়তের মাসআলার ক্ষেত্রে এমন করার কোনো অবকাশ নেই। আরেক হল দ্বীনী বিষয়ে মাসআলা বলার যোগ্যতা রাখে না এমন ব্যক্তি থেকে ফতোয়া নিয়ে আমল করল। এটাও হারাম। এ বিষয়েই হাদীস শরীফে এসেছে-

فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

'নিজেও গোমরাহ হল, অন্যকেও গোমরাহ করল।'

এবার আমরা ওই ভাইদের কথা নিয়ে একটু ভাবি, যারা বলেন, তারা নাকি তাকলীদ করেন না। তাহলে তারা কি মুজতাহিদ? কেননা, তাকলীদ তো মুজতাহিদগণই করেন না। যারা মুজতাহিদ না তাদের তো তাকলীদ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সুতরাং তারা তাকলীদ করে না মানে তারা মুজতাহিদ। অর্থাৎ তাদের অঞ্চলের নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দ্বীনী শিক্ষিত, জেনারেল শিক্ষিত, ব্যবসায়ী, যানচালক সবাই আরবী ভাষা জানে। আরবী ব্যাকরণ, বালাগাত ইত্যাদি জানে। সরাসরি কুরআন হাদীস, তাফসীর ও উসূল সব পড়তে পারে। কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, উলূমুল হাদীস তথা হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধির জ্ঞান, উসূলুল ফিক্হ, সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া প্রভৃতি মোটকথা সরাসরি নিজে ইজতেহাদ বা গবেষণা করে মাসআলার সমাধান বের করার জন্য যা যা বিদ্যা-শাস্ত্র দরকার সব জানে এবং তাদের অঞ্চলের সবাই নিজেদের মাসআলার সমাধান নিজেরাই বের করে। কাউকে জিজ্ঞেস করে না। তাদের অঞ্চলে কোনো একক মুফতী নেই, সবাই মুফতী। কোনো ফতোয়া কেন্দ্র নেই। কেননা তার প্রয়োজনই নেই। দ্বীনের যেকোনো বিষয়ে তাদের প্রত্যেকে সমান পারদর্শী।

জানা কথা, এটা এক অবাস্তব ও অসম্ভব বিষয়। তাই তাদের উক্ত কথাও অবাস্তব। কেননা, যে এই পর্যায়ের না তাকে তাকলীদ করতেই হবে। এমনকি যে ভাই গর্ব করে বলেন, আমি তাকলীদ করি না, খোদ তার মধ্যেই দেখুন, এই যোগ্যতাগুলো আছে কি না। সে আরবী

পড়তে পারে কি না, না বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ দেখে পড়ে। বরং যে আরবীও পড়তে পারে কিন্তু ইজতেহাদ বা নিজে গবেষণা করে মাসআলার সমাধান বের করার জন্য যতগুলো শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকা দরকার সেসব শাস্ত্র জানে না অথবা সেগুলোতে পাণ্ডিত্য নেই, সেও তো ইজতেহাদ করতে পারে না। তাকে তাকলীদই করতে হয়। তাহলে যে আরবীই পড়তে পারে না, সে কীভাবে বলতে পারে, সে তাকলীদ করে না।

আচ্ছা, তিনি কি একটি হাদীস সহীহ কি সহীহ না, বর্ণনাকারী 'ছিকা' কি 'ছিকা' না, হাদীসটি মানসূখ কি মানসূখ না, তার বিপরীতে কোনো আয়াত আছে কি না, থাকলে তার ব্যাখ্যা কী, মুফাস্সিরীন ওই আয়াত সম্পর্কে কী বলেন, ওই হাদীসের বিপরীতে অন্য কোনো হাদীস আছে কি না, থাকলে সেটির মান কী, সেটিও যদি একই মানের হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে, কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য, কোনটি আগের, কোনটি পরের, উভয় হাদীস সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের আমল ও কর্মপদ্ধতি কী? তাদের ফতোয়া কী ইত্যাদিএ সবকিছুই কি তিনি নিজে নির্ণয় করতে পারেন, নাকি এগুলো অন্যের মাধ্যমে জানেন?

তিনি কি নিজের বা অন্যের যেকোনো মাসআলার সমাধান নিজেই বের করেন, নাকি অন্য কারো শরণাপন্ন হন। জানা কথা, তিনি ও তার অঞ্চলের সবাই দ্বীনী মাসআলা জানার জন্য তাদের বিজ্ঞজনের কাছে উপস্থিত হন। সেসব 'বিজ্ঞজনের' নির্দেশনা হিসেবে আমল করেন। তাই তো তাদের অঞ্চলে মুফতী আছেন, ফতোয়া কেন্দ্র আছে; সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ আছে, ফতোয়া বোর্ড আছে, প্রধান মুফতী আছেন। মুফতীদের ফতোয়াগুলো খণ্ডে খণ্ডে ছাপা হয়। তারা সেসব ক্রয় করে নিজেরা পড়েন এবং বিলি করেন। এমন কি সেগুলোর অনুবাদও করেন এবং ভিনদেশিদের মাঝে বিতরণ করেন, যেন তারাও তাদের মতো এসব শায়েখের তাকলীদ করে। এটাই তো তাকলীদ এবং মহা তাকলীদ।

কী বিচিত্র বিবেচনা! ইমাম মালেক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম আহমদ রহ.-এর কাছে মাসআলা জানলে বা তাঁদের ফতোয়া সংকলনের অনুসরণ করলে হয়ে যায় তাকলীদ, আর নাসের আলবানী রহ. তথা 'শায়েখ'দের কাছে মাসআলা জানলে তাকলীদ হয় না?!

মাসআলা তিন ধরনের এক. যেগুলো সরাসরি কুরআন হাদীসে উল্লেখ নেই। বরং কুরআন হাদীস গবেষণা করে মূল সূত্র নির্ণয় করে তার সমাধান বের করতে হয়। এ ধরনের মাসআলা সংখ্যায় হাজারো; বরং প্রায় মাসআলাই এ ধরনের। মাযহাব অনুসারীরা এসব ক্ষেত্রে তাদের ইমামদের জিজ্ঞেস করে। তাই তারা নাকি তাকলীদ করে ফেলে। আর যিনি বলেন তাকলীদ করেন না, তিনি এসব ক্ষেত্রে কী করেন? নিজে গবেষণা করেন, নাকি যে শায়েখের অনুসারী তাকে জিজ্ঞেস করেন? তাহলে এটা কেন তাকলীদ হবে না?

দুই. কিছু মাসআলা আছে যেগুলো কুরআন হাদীসে উল্লেখ আছে, কিন্তু কুরআন হাদীসে সেগুলোর ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী তথ্য পাওয়া যায়। যারা মাযহাব অনুসরণ করে তারা এসব ক্ষেত্রে তাদের চার মুফতীর শরণাপন্ন হয়। চার মুফতী সকল তথ্য চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যে তথ্যটি আমলযোগ্য তা নির্ধারণ করে দেন এবং তার অনুসারীরা সে মোতাবেক আমল করে। আর এতে নাকি তাদের তাকলীদ করা হয়ে যায়!

তো যে ভাই তাকলীদ করেন না বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে কী করেন? তিনি কি এসব তথ্য নিজে নিজেই বিচার-বিশ্লেষণ করেন, নাকি তিনিও তার অঞ্চলের ও তার মতাদর্শের 'শায়েখে'র শরণাপন্ন হন? আর সে শায়েখ তার অসম্পূর্ণ জ্ঞানের গবেষণা দ্বারা একটি সমাধান বলে দেন আর তিনি সে মোতাবেক আমল করেন। এটাই তো তাকলীদ।

তিন. কিছু মাসআলা আছে, যা সরাসরি স্পষ্টভাবে কুরআন হাদীসে উল্লেখ আছে এবং তথ্যের মাঝেও কোনো বৈপরীত্ব নেই। এসব মাসআলা কুরআন হাদীস পড়লে জানা যাবে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য আগে কুরআন হাদীস পড়া থাকতে হবে। তাহলে সে জানতে পারবে, মাসআলাটি কুরআন হাদীসে আছে কি নেই। কিন্তু যে কুরআন হাদীস পড়তে জানে না, সে তো জানবে না, মাসআলাটি কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে আছে। তাই এ ক্ষেত্রেও তাকে মুফতীর শরণাপন্ন হতে হয়।

যারা বলে তাকলীদ করে না, তারা নিজেরা কুরআন হাদীস পড়ে এসব মাসআলার সমাধান বের করে, নাকি তারাও তাদের শায়েখদের কাছে যায় এবং তাদের কথা অনুসরণ করে? জানা কথা, তারাও তাদের শায়েখদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কথার অনুসরণ করে। আর এটার নামই হল তাকলীদ।

কী বিচিত্র! যিন্দেগির সব ক্ষেত্রে, সব ধরনের মাসআলায় তাকলীদ করে অথচ দাবি করে, তারা তাকলীদ করে না। এর চেয়ে অবাস্তব কথা আর কী হতে পারে!

মূলত তাদের এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির উদ্রেক হয় এ কারণে যে, তারা নামাযের প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাসআলায় কয়েকটি হাদীস জানে আর পুরো জীবনের হাজারো মাসআলার দলিল জানা তো দূরের কথা, দলিল জানার আগ্রহ বা প্রয়োজনীয়তাও তাদের মনে আসে না। এতে তারা ভেবে নেয়, তারা সরাসরি হাদীস মানে, কারো তাকলীদ করে না। অথচ এসব মাসআলায়ও সে তাকলীদ করেছে এবং এসব হাদীসও সে তাকলীদের মাধ্যমেই পেয়েছে।

বিষয়টির বিবরণ এই একটি হাদীস সহীহ নাকি যয়ীফ, তা বোঝার জন্য প্রথমে এই হাদীস কত সূত্রে বর্ণিত তা বের করতে হয়। প্রত্যেক সূত্রের সনদ তাহকীক করতে হয়। প্রথমে প্রতিটি সনদের প্রত্যেক রাবী বা বর্ণনাকারীর জীবনী বের করে দেখতে হয় তিনি 'ছিকা' না

'যয়ীফ'। অনেক সময় জীবনীগ্রন্থে একই রাবী সম্পর্কে বিপরীতমুখী অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়। সেখান থেকে দলিল-প্রমাণের আলোকে সঠিক মন্তব্যটি উদ্ধার করা সূক্ষ্ম ও সুকঠিন ব্যাপার। তারপর দেখতে হয় এসব সনদে পরস্পর কোনো বিরোধ আছে কি না। এরপর দেখতে হয় কোনো রাবী বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণনা করছেন কি না, যা তার সঙ্গীদের মধ্যে কেউই বর্ণনা করছে না। অনেক সময় সনদের বাহ্যিক দেখে সব ঠিকঠাকই মনে হয়, কিন্তু তাতে খুব সুপ্ত ত্রুটি থাকে। এটা মারাত্মক সমস্যা। সাধারণ হাদীস বিশারদরাও তা ধরতে পারেন না। সেগুলো ধরতে বিশেষ যোগ্যতা লাগে। তো সনদে এসব ত্রুটি আছে কি না, তাও দেখতে হয়।

এরপর মতন নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে হয়। সেটি কুরআন ও সুন্নতে মুতাওয়াতিরার পরিপন্থী কি না, সাহাবায়ে কেরামের সামগ্রিক ফতোয়া ও আমলের পরিপন্থী কি না অথবা তার মধ্যে অন্য কোনো ধরনের আপত্তি আছে কি না, যাকে হাদীস শাস্ত্রে 'নাকারাহ' বলা হয়। এ ধরনের আরো অনেক কিছু দেখেই একটি হাদীস তাহকীক করতে হয়। একটি হাদীস এতসব পর্বে গবেষণার পর মানোত্তীর্ণ হলে তখনই তাকে সহীহ বলা হয়।

সুতরাং যে ভাই গুটিকয়েক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় কয়েকটি হাদীস মুখস্থ করে তিনি বলেন, তিনি তাকলীদ করেন না। প্রশ্ন হয়, এসব হাদীস যেসব কিতাবে আছে তা কি তিনি সব খুলে বের করেছেন, নাকি তার শায়েখ বলে দেওয়ায় অথবা তার শায়েখের কোনো কিতাব পড়ে তা জানতে পেরেছেন? বা সর্বোচ্চ বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ পড়ে জানতে পেরেছেন?

এরপর প্রশ্ন হয়, হাদীস যাচাইয়ের যত পর্ব আছে, এসব হাদীসকে সকল পর্বে তিনি নিজেই যাচাই করেছেন এবং সকল পর্বে মানোত্তীর্ণ হয়ে সহীহ হওয়াটা তিনি নিজেই গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন, নাকি এসব পর্ব তার শায়েখই তাকে সম্পাদন করে দিয়ে হাদীসগুলোর একটি অবস্থান তাকে জানিয়ে দিয়েছেন আর তিনি তা

মানছেন এবং সে বলেই বলছেন, 'আমরা তাকলীদ করি না'?

প্রায় ক্ষেত্রে এই ভাইয়েরা আরবীই পড়তে পারেন না, তাহলে কী করে হাদীসের কতগুলো কিতাব আছে, হাদীসটি কত সূত্রে বর্ণিত আছে, রাবীদের জীবনীর কিতাব কী কী, তা খোলার নিয়ম কী, সেগুলো থেকে সঠিক কথাটি বের করা ইত্যাদি জানবে! তিনি বরং হাদীসটি নাসের আলবানী ও তার পরের গুটি কয়েক 'শায়েখ' যে সহীহ বলেছেন, তাই সেটিকে সহীহ বলছেন। এটাই তো তাকলীদ। যারা চার ইমামের অনুসরণ করে, তারা হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধির জানার ক্ষেত্রে তাদের ইমামের শরণাপন্ন হয়। আর এই ভাইয়েরা চার ইমামের শরণাপন্ন না হয়ে বর্তমানকালের কিছু শায়েখের শরণাপন্ন হয়। তারা গবেষণা করে তাদেরকে হাদীসটির মান জানায়, তারা সেভাবে জানে ও মানে। কিন্তু কী প্রোপাগান্ডা! একই তাকলীদ নিজে করে অন্যকে বলে, তারা তাকলীদ করে আর তিনি নাকি তাকলীদ করেন না!!

সুতরাং তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকলীদ করে। এমনকি যে কয়েক হাদীস জেনে গর্ব করে বলে, তারা তাকলীদ করে না, সেগুলোতেও একেবারে নিরেট ও অন্ধ তাকলীদ করে, আর বলে বেড়ায়, তারা তাকলীদ করে না। এই ভাইয়েরা যদি আল্লাহর দেওয়া আকল ও বিবেক একটু কাজে লাগাত কতই না ভালো হত!

'সহীহ হাদীসই ইমামের মাযহাব' আলোচনায় এ বিষয়ে অনেক কিছু আছে এবং সামনের আলোচনায়ও এ সম্পর্কে আরো আলোচনা হবে। উভয় আলোচনা বুঝে পড়লে বিষয়টি আরো পরিষ্কার ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

আগে আমরা সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া পড়েছি। বোর্ডের প্রধান শায়েখ বিন বায রহ. এবং তার সঙ্গীগণ যা লিখেছেন, তা পুনরায় পড়ার অনুরোধ করছি।

তারা বলেছেন, যাদের ইজতেহাদ তথা নিজে গবেষণা করে মাসআলা বের করার যোগ্যতা আছে যেমন, মুজতাহিদ ইমাম, তারা নিজেরাই কুরআন হাদীস থেকে সমাধান বের করবে আর যাদের এমন যোগ্যতা নেই, তাদের ক্ষেত্রে ফতোয়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে-

وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ .

'আর যে এমন নয় (ইজতেহাদ করার যোগ্যাতা রাখে না) তার জন্য ওয়াজিব হল আহলুল ইলম তথা উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করা।'
ফাতাওয়ায়ে লাজনাতুদ দায়েমাহ ৫/২৬

> শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ. বলেন-
>
> وَالتَّقْلِيْدُ فِي الْوَاقِعِ حَاصِلٌ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَلَاشَكَّ أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَإِلٰى عَهْدِنَا هٰذَا مَنْ لَايَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَى الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ لِجَهْلِهِ وَقُصُورِهِ، وَوَظِيْفَةُ هٰذَا أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ، وَسُؤَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ الأَخْذَ بِمَا قَالُوْا، وَالأَخْذُ بِمَا قَالُوا هُوَ التَّقْلِيدُ.

'বাস্তবে তাকলীদ সাহাবা যুগ থেকেই চলে এসেছে। কেননা, সাহাবীদের যুগ থেকে আমাদের পর্যন্ত প্রত্যেক সময়েই এমন মানুষ ছিল, যারা নিজে নিজে কুরআন হাদীস গবেষণা করে বিধান জানতে সক্ষম নয়, নিজের অজ্ঞতা ও যোগ্যতার অভাবের কারণে। আর তাদের কর্তব্য হল আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস করা। আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস করা মানে তাদের কথা মানা। আর এটিই হল তাকলীদ।'
ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব ২/২২০

তিনি আরো বলেন-

أَنْ يَكُوْنَ الْمُقَلِّدُ عَامِّيًّا لَايَسْتَطِيْعُ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ، فَفَرْضُهُ التَّقْلِيْدُ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ.

'সাধারণ মানুষ যে নিজে শরীয়তের হুকুম জানতে পারে না, তার জন্য তাকলীদ করা ফরয। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যারা জানে তাদের জিজ্ঞেস কর যদি না জান।'

বিন বায রহ. ও মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ. আরব দেশেরই আলেম। তারাও মানুষকে সহীহ হাদীসের দিকে ডাকেন। নাসিরুদ্দীন আলবানী মরহুম তাদের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের লোক। সবাই বলে গিয়েছেন, তাদের অঞ্চলের যারা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখে না, তাদের জন্য তাকলীদ ফরয এবং তারা তাকলীদই করে। কিন্তু কী বিচিত্র! তাদের তাকলীদকারীরা বলে, আমরা কোনো তাকলীদ করি না!

শায়েখ বলে, শিষ্যরা তাকলীদ করে; কিন্তু শিষ্য-অনুসারীরা বলে, তাকলীদ করে না! কী অবাক কাণ্ড!

শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীনের কথা স্পষ্ট, 'যেহেতু এ ধরনের ব্যক্তির জন্য আহলে ইলম তথা বিদ্বগ্ধ আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আর সেটাই হল তাকলীদ।' একথা থেকে পরিষ্কার যে তারা তাকলীদ করে। পাশাপাশি এটাও পরিষ্কার, তারা মাযহাবও মানে। সুতরাং যে তাকলীদ করে সে মাযহাবও মানে। যার জন্য তাকলীদের বিকল্প নেই, তার জন্য মাযহাবেরও বিকল্প নেই। তাই যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকলীদ করেও বলেন, মাযহাব মানি না, এটা এক আজব অবাস্তব কথা! বরং যারা মাযহাবী, তারা চার ইমামের মাযহাব মানে আর এরা মানে নাসের আলবানী, বিন বায রহ. প্রমুখের মাযহাব।

উল্লেখ্য, আমার কথার উদ্দেশ্য বিন বায রহ. ও আলবানী রহ. প্রমুখের গবেষণাকে সালাফের মাযহাবের মান দেওয়া নয়, তাদেরকে চার ইমামের কাতারে নেওয়া নয় এবং তাদের গবেষণাকে মাযহাব নাম দিয়ে ইমামদের মাযহাবের মান দেওয়া নয়। আমার উদ্দেশ্য শুধু যারা বলে তাকলীদ করি না, তারাও যে তাকলীদ করে এবং তারাও যে কারো গবেষণা মেনেই চলে তা বোঝানো। শুধু এই উদ্দেশ্যেই তুলনা করা। অন্যথায় কোথায় চার ইমাম আর কোথায় তারা! আর কোথায় চার ইমামের মাযহাব আর কোথায় এসব গবেষণা!

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়বে, নাকি চুপ থাকবে মাসআলাটি জানার দরকার। যারা চার ইমামকে মানেন, তারা চার ইমামের কাছে যান। যারা বিন বাযকে মানেন তারা তার কাছে যান আর যারা নাসের আলবানীকে বড় মনে করেন তারা তার কাছে যান।

> আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এ মাসআলা সম্পর্কে কুরআন হাদীসে মোটামুটি ছয়টি নস ও পাঠ রয়েছে

এক. সূরা আরাফের আয়াত 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে।'

দুই. আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস 'যখন ইমাম পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে।'

তিন. আবু মুসা আশয়ারী রা.-এর হাদীস 'যখন ইমাম পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে।'

চার. 'যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ল না, তার জন্য নামায নেই।'

পাঁচ. 'যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামায অসম্পূর্ণ।'

ছয়. 'যার নামাযে ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত।'

এই মাসআলায় আরো কিছু নস ও পাঠ আছে, সব উল্লেখ করলাম না। ইমাম মালেক রহ. বলেন, যেসব নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করা হয়, সেসব নামাযে মুক্তাদী কেরাত পাঠ করবে না।'

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সব রাকাতেই মুক্তাদী সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করবে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. বলেন, মুক্তাদী চুপ থাকবে। ইমামের কেরাতই মুক্তাদীর কেরাত।

শায়েখ নাসের আলবানী মরহুম বলেন, যেসব নামাযে সশব্দে কেরাত পঠিত হয়, সেসব নামাযে মুক্তাদী সূরায়ে ফাতেহা পড়বে না। অন্য নামাযে পড়বে।

শায়েখ বিন বায মরহুম বলেন, সব নামাযেই মুক্তাদীর কেরাত পড়তে হবে।

এরপর প্রত্যেক জিজ্ঞেসকারী আপন মুফতীর সমাধান সংগ্রহ করেন এবং সে মোতাবেক আমল করেন।

এখানে প্রত্যেক জিজ্ঞেসকারীর কাজ একই ধরনের। প্রত্যেকে নিজনিজ অনুসরণীয়কে জিজ্ঞেস করেছে এবং তার দেওয়া ফতোয়াকে মেনেছে। সবাই তাকলীদ করেছে। কেউ ইমাম মালিক রহ.-এর, কেউ ইমাম আহমদ রহ.-এর, কেউ ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর, কেউ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর, কেউ আলবানী রহ.-এর, কেউ বিন বায রহ.-এর। অর্থাৎ প্রত্যেকে মাযহাব মেনেছে। কেউ

ইমাম মালিক রহ.-এর মাযহাব, কেউ ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব, কেউ ইমাম আহমদ রহ.-এর মাযহাব, কেউ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব, কেউ আলবানী রহ.-এর মাযহাব, কেউ বিন বায রহ.-এর মাযহাব।

কিন্তু এই ভাইয়েরা এত স্পষ্ট সত্য অবলীলায় অস্বীকার করে বলে, তারা মাযহাব মানে না।

প্রশ্ন হয়, এই মাসআলায় যে বিধানটি আপনি পেয়েছেন, সেটি কি আপনি নিজেই গবেষণা করে বের করেছেন? এই মাসআলায় যতগুলো নস ও পাঠ (আয়াত, হাদীস ও উক্তি) আছে, সবগুলো কি আপনি নিজে কিতাবাদি ঘেঁটে ঘেঁটে বের করেছেন। এরপর প্রত্যেক সনদে যত রাবী বা বর্ণনাকারী আছে তাদের জীবনী আপনি নিজে কিতাবাদি খুলে দেখেছেন এবং প্রত্যেকের সঠিক মান ছিকা নাকি দুর্বল না মাঝামাঝি, মুহাদ্দিসীনের অসংখ্য মতামত থেকে সঠিক মতটি আপনি নিজেই নিরূপণ করেছেন? এরপর প্রতিটি সনদের মান, হাদীসের মান কি আপনি নিজেই গবেষণা করে নির্ণয় করেছেন? এ সবকিছুর জন্য হাদীস শাস্ত্রে অনেক পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়, তাহলে কি আপনি সাধারণ মুহাদ্দিস থেকে ঊর্ধ্বের হাদীস বিশারদ!

একটি মাসআলা তাহকীক করতে হলে সাহাবী তাবেয়ীর আমল ও ফতোয়া দেখতে হয়, আপনি কি সেসব নিজে বের করেছেন? সবগুলো সনদ দেখেছেন এবং তাহকীক করেছেন? একটি মাসআলায় অনেক নস ও পাঠ থাকলে কোনটি নাসেখ কোনটি মানসূখ জানতে হয়, আপনি কি তা জেনেছেন এবং নিজে নিজেই গবেষণা করে জেনেছেন?

আচ্ছা, এই মাসআলায় ছয়টি পাঠ আমরা উল্লেখ করলাম, আরো বহু পাঠ এই মাসআলায় রয়েছে, আপনি কি সেগুলো দেখেছেন এবং নিজে যাচাই করেছেন? এ বিষয়ে পূর্বাপর অনেক আলেম-উলামা অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন, আপনি কি সবগুলো পড়েছেন?

এত সব পাঠ যেগুলো সামগ্রিকভাবে বিরোধপূর্ণ, এগুলো থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ ও প্রাধান্যদান কি আপনি নিজেই গবেষণা করে দিয়েছেন?

আচ্ছা, আপনি সশব্দে কেরাত পাঠের নামাযে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা না-পড়াকে গ্রহণ করলেন, তাহলে অন্য আয়াত ও হাদীসগুলোকে কোন অজুহাতে অগ্রহণীয় নির্ণয় করলেনকুরআন হাদীস থেকে কি এর কোনো দলিল-প্রমাণ আপনার কাছে আছে? একটি বিরোধপূর্ণ তথ্যবহুল মাসআলায় আরো অনেক বিষয় গবেষণা করতে হয়, সেগুলো আর উল্লেখ করলাম না। সব কাজ ও পর্ব আপনি নিজেই সম্পাদন করেছেন, নাকি নাসির আলবানী রহ. তাঁর মতো করে এসব পর্ব সম্পাদন করে একটি বই লিখে দিয়েছেন, সেখানে তিনি এটি সহীহ, সেটি দুর্বল; এটি মানসূখ সেটি অগ্রহণযোগ্য—এসব বলে নিজেরটিকে সহীহ রেখে অন্যগুলোকে অগ্রহণযোগ্য বানিয়ে বই ছাপিয়ে দিয়েছেন আর সে বইয়ের মূল কপি তো পরের কথা ভুলে ভরা অনুবাদ পড়ে এবং একদম অন্ধ তাকলীদ করে সেগুলোকে দাবি করছেন, আপনি মাযহাব মানেন না?

এ ধরনের সস্তা তাকলীদ অবলম্বন করেছেন আর মনে-প্রাণে এমন বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে, এর বিপরীতে হাজার বছর ধরে চলে আসা সুন্নাহ ও আমলকে ভুল আখ্যা দিচ্ছেন।

আরেকটি উদাহরণ, রুকু থেকে সেজদায় যাওয়ার নিয়ম কী? জমিনে আগে হাঁটু রাখবে না হাত, এ নিয়ে মৌলিকভাবে যে হাদীস পাওয়া যায় তা হল-

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

'তোমাদের কেউ যখন সেজদা করবে তখন যেন উটের মতো না বসে। সে যেন হাঁটু দুটির আগে হাত রাখে।' সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৪০

আরেকটি হল ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বর্ণিত হাদীস-

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

'আমি নবীজীকে দেখেছি, সেজদায় যাওয়ার সময় তিনি প্রথমে হাঁটু রাখতেন, এরপর হাত রাখতেন।' জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮

এখানে মূল বিষয় হল, এই দুটি হাদীসের কোনটি সহীহ ও কোনটি যয়ীফ।

এখন কারো সেজদায় যাওয়ার নিয়ম জানার প্রয়োজন। তাই সে সৌদির প্রধান মুফতী এবং কেন্দ্রীয় ফতোয়া বিভাগের প্রধান শায়েখ বিন বাযের কাছে গেল। তিনি সবকিছু গবেষণা করে তাকে জবাব দিলেন, আগে হাঁটু রাখবে, পরে হাত রাখবে। একইভাবে আরেকজন গেল সৌদির সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীনের কাছে। তিনিও একই জবাব দিলেন। কারণ, তাদের গবেষণায় প্রথম হাদীসটি দুর্বল, দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ। আরেকজন গেল শায়েখ আলবানীর কাছে। তিনি জবাব দিলেন এর বিপরীত। আগে হাত রাখবে, পরে হাঁটু রাখবে। কারণ, তার গবেষণায় প্রথম হাদীসটিই সহীহ দ্বিতীয়টি দুর্বল। এবার প্রত্যেক জিজ্ঞেসকারী স্ব স্ব মুফতীর জবাব মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করে।

এখানেও প্রত্যেক জিজ্ঞেসকারী তাকলীদ করেছে এবং স্ব স্ব মুফতীর মাযহাব মেনেছে। কেননা, এই দুই হাদীসের কোনটি সহীহ তা নিয়ে সবাই গবেষণা করে নিজ নিজ জিজ্ঞেসকারীকে উত্তর দিয়েছে। আর জিজ্ঞেসকারী স্ব স্ব মুফতীর গবেষণা অনুযায়ী আমল করেছে। এই গবেষণাই হল মাযহাব।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই দুই হাদীসের কোন্টি সহীহ কোন্টি যয়ীফ, কোনোটিই কিন্তু হাদীসে নেই বা নবীজী বলে

যাননি। বরং এসব মুফতী নিজস্ব গবেষণায় তা নির্ণয় করেছেন। আর সে গবেষণা নিজেদের জিজ্ঞেসকারীকে পেশ করেছেন এবং ওই মোতাবেক সে আমল করেছে।

এখানে জিজ্ঞেসকারী মূলত সরাসরি হাদীস অনুসরণ করেননি। বরং মুফতী সাহেবের গবেষণা অনুসরণ করেছেন। সে গবেষণায় যেটি সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে সেটি অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু আমরা কত নির্বোধ, চতুর্দশ শতাব্দীর এক উম্মতীর গবেষণাকে আমরা হাদীসের মত মনে করে বসে আছি। আবার এই গবেষণাকে অনুসরণ ও অন্ধ বিশ্বাস করেও বলি, আমি তাকলীদ করি না, আমি মাযহাব মানি না, আমি হাদীস মানি।

খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, আপনি নাসের আলবানী রহ.-এর বা আসাদুল্লাহ গালিবের নামাযের যে বইতে উদাহরণস্বরূপ, মুক্তাদীর কেরাত পড়ার অধ্যায়টি পড়লেন এবং সেখানে এই মাসআলায় উল্লিখিত ছয়টি নস ও পাঠের সমাধানে আসাদুল্লাহ গালিব যে বললেন, সূরা আরাফের আয়াত এবং ওসব হাদীস যেগুলো ইমাম কেরাত পড়লে মুক্তাদীকে চুপ থাকতে বলা হয়েছে, এগুলো আম তথা ব্যাপক। এরপর এগুলো থেকে সূরা ফাতেহাকে আলাদা বা খাছ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তাদী কেরাত পড়বে না। তবে সূরা ফাতেহার ব্যাপার ভিন্ন, মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়বে।

আরেকটি হাদীস, একদিন নবীজী ফজর নামায পড়ছেন। তখন পেছনে কোনো মুক্তাদীও তাঁর সঙ্গে কেরাত পড়ছে। নামায শেষে নবীজী বললেন, আমার সঙ্গে কেরাত নিয়ে টানাহেঁচড়া হচ্ছে কেন? অর্থাৎ নবীজী বিরক্ত হলেন। সাহাবী আবু হুরায়রা রা. বলেন-

فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ.

‘এরপর থেকে সাহাবায়ে কেরাম সশব্দের কেরাতের নামাযে নবীজীর সঙ্গে কেরাত পড়া ছেড়ে দেন।’

ড. আসাদুল্লাহ গালিব এই হাদীসের শেষ অংশ মুদরাজ তথা হাদীস নয় সাব্যস্ত করেছেন এবং সবক্ষেত্রে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে নাসের আলবানী রহ. এই মাসআলায় সংশ্লিষ্ট সব নস ও পাঠ সামনে রেখে যে সমাধান দিয়েছেন, তা ড. আসাদুল্লাহ গালিবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা এই প্রথমে মুক্তাদীকে সকল নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তে বলা হয়। এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং শুধু নিঃশব্দে কেরাতের নামাযে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠের বিধান অবশিষ্ট থাকে। সশব্দে কেরাতের নামাযে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়বে না, তা রহিত এবং ড. আসাদুল্লাহ গালিব যে হাদীসকে মুদরাজ বলেছেন, সেটিকে বরং সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস বলেছেন। তেমনিভাবে, ‘যার জন্য ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত।’ এই হাদীসকে ড. আসাদুল্লাহ গালিব নিতান্তই দুর্বল বলেছেন। কিন্তু নাসের আলবানী রহ. এটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

সুতরাং আসাদুল্লাহ গালিব যে নামাযে কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকার আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে সূরা ফাতেহাকে খাস করেছেন, এটা শুধুই তার নিজস্ব গবেষণায়। এ ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো হাদীস নেই। তেমনিভাবে যে হাদীসটিকে মুদরাজ বলেছেন এবং যে হাদীসকে নিতান্তই দুর্বল বলেছেন, তা শুধুই তার নিজস্ব গবেষণায়, কোনো হাদীসের ভিত্তিতে নয়। কারণ, এই হাদীসটি মুদরাজ বা যয়ীফ তা নবীজী বলে যাননি। এজন্যই নাসের আলবানী রহ.-এর সমাধান বিপরীত হয়েছে। কারণ, এক্ষেত্রে স্পষ্ট হাদীস থাকলে তার বিপরীত কেউ বলতে পারত না। ঠিক তেমনি আলবানী সাহেব এই মাসআলার যেভাবে সমাধান দিয়েছেন, সেটিও শুধু নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে। যে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যেটিকে শক্তিশালী বলেছেন, তাও নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে। কোনো স্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং যারা ড. গালিবের বই পড়ে সেটা মানে, সে ড.

গালিবের 'মাযহাব' ও গবেষণাই মানছেন। যেমন, যে আলবানীর বই পড়ে তাকে অনুসরণ করছে, সে আলবানীর 'মাযহাব' ও গবেষণাই মানছেন।

এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, ড. গালিব গবেষণার যোগ্যতা রাখেন কি রাখেন না। আর শায়েখ আলবানীর গবেষণা কোন স্তরের।

অনুরূপভাবে ড. আসাদুল্লাহ গালিব রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনায় বলেন, শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত ওঠানোর যেসব হাদীস আছে, তার সবই যয়ীফ। এটা তার নিজস্ব মাযহাব এবং নিজস্ব গবেষণা বা বলা যায় ভুল মাযহাব ও ভুল গবেষণা। খোদ আলবানী রহ.ও এ বিষয়ের একটি হাদীসকে সুনানে আবু দাউদের টীকায় সহীহ বলেছেন। যারা আসাদুল্লাহ গালিবের বই পড়ছেন, তারা তার মাযহাবই মানছেন।

রুকু থেকে উঠে সেজদায় যাওয়ার প্রসঙ্গে ড. আসাদুল্লাহ গালিব বলেন, প্রথমে হাত রাখবে, এরপর হাঁটু রাখবে। এটা সুন্নত। আলবানী মরহুম বলেন, এটা ফরয। এগুলো প্রত্যেকের মাযহাব ও গবেষণা, হাদীস নয়। কিন্তু বিন বায রহ. বলেন, আগে হাঁটু রাখবে, পরে হাত রাখবে। এটিই সুন্নত এবং শক্তিশালী। এটিও তার নিজস্ব গবেষণা ও 'মাযহাব'। সরাসরি হাদীস নয়। সুতরাং যারা যাকে মানছেন তারা তার মাযহাব বা গবেষণাই মানছেন।

ওযু ছাড়া কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যাবে কি না? এ বিষয়ে আলবানী রহ. বলেন, পারবে। কেননা, নিষেধাজ্ঞার যে হাদীস আছে, তা তার মতে যয়ীফ। এটাও তার নিজস্ব গবেষণা তথা নিজস্ব মাযহাব। পক্ষান্তরে বিন বায রহ. ও সালেহ আলউছাইমীন রহ. বলেন, পারবে না। এটা তাদের মাযহাব। যারা যাকে মানছেন, তারা তার মাযহাবই মানছেন এবং তারই তাকলীদ করছেন।

উল্লেখ্য, ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ না-করার হাদীস বিশুদ্ধ এবং অনেক বেশি শক্তিশালী। সনদগতভাবে যেমন বিশুদ্ধ, তেমনিভাবে নববীযুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন আমল এবং তার আলোকে সর্বযুগের মুফতীদের ফতোয়া দানের দ্বারা তার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত ও সর্বজনবিদিত।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, সকল আলেম এটি গ্রহণ করেছেন এবং এর ওপরে আমল করেছেন। সুতরাং এই হাদীসকে যয়ীফ বলা মারাত্মক ভুল এবং বিচ্ছিন্ন মত। সুতরাং বিনা ওযুতে কুরআন স্পর্শ করা নাজায়েয। এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম একমত। ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, মুসলিম বিশ্ব যাদের হাতে এবং যাদের শিষ্যদের হাতে ফতোয়ার দায়িত্ব তারা সবাই একমত, পবিত্রতা ছাড়া কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যাবে না। সুতরাং আলবানী সাহেবের এই মত একটি মারাত্মক ভুল মত, যা গোটা উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই এটা মাযহাবও নয়, বরং নিতান্তই বিচ্ছিন্ন একটি মত। আমরা শুধু বোঝার জন্য এই উদাহরণটি এনেছি, অন্যথায় বিচ্ছিন্ন মত মাযহাবের শিরোনামে আসে না।

এভাবে প্রত্যেকটি মাসআলাতেই আলবানী মরহুম ও ড. গালিবসহ অন্যরা যে যেটা পেশ করেছেন, সেটা তারই 'মাযহাব' এবং যে সেগুলো মানল, সে তার মাযহাবই মানল।

কিন্তু হাদীস-ফিকহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি তো দূরের কথা, কুরআন হাদীস নিয়ে ন্যূনতম পড়াশোনাও নেই, এমনকি আরবীও পড়তে পারে না, এ ধরনের ব্যক্তি যখন ড. গালিব ও আলবানী মরহুমের ভাসা-ভাসা বইগুলোর অনুবাদ (মূল বইও নয়) পড়ে আর সেখানে দেখে অমুক হাদীস যয়ীফ, অমুক হাদীস সহীহ, এক্ষেত্রে এটাই সহীহ আমল, অন্যগুলো মানুষের কথা, বাপ-দাদার অনুসরণ, তখন তারা তাদের এসব কথাকে ওহীর মতো মনে করে। অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। আর মনে করে, এর বিপরীতে কোটি কোটি আলেম-উলামা, আমজনতা যুগ যুগ ধরে ভুল করে আসছে। তাদের কোনো দলিলই নেই। তাদের মতের কোনো সত্যতাই নেই। যেমন, সমাজে যেসব

বানোয়াট আমল আছে, সেগুলোও এসব আমলের মতো বানোয়াট। তার এই মারাত্মক ভুল চিন্তা একমাত্র ড. গালিব ও আলবানী মরহুম যেটাকে যেভাবে বলেছেন তা যাচাই না করে গোগ্রাসে গলাধঃকরণের কারণেই। এরপরও তারা বলে, তারা কারো মাযহাব মানে না!

ধরুন, বিজ্ঞানের কোনো সূত্র নিয়ে মহাপণ্ডিত দুই বিজ্ঞানির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। উভয়ের কাছেই দলিল-প্রমাণের স্তূপ রয়েছে। উভয়েরই বহু অনুসারী। হঠাৎ একজনের এক অনুসারী একটি চটি বই লিখে নিজের পণ্ডিতের দলিলগুলো সংক্ষেপে শক্তিশালী করে উল্লেখ করল। অপর পণ্ডিতের প্রমাণগুলো টীকাটিপ্পনিতে নিতান্তই দুর্বল আকারে উল্লেখ করল। এরপর সেই চটি বই বিলি-বিক্রি হতে লাগল হাঁটে-ঘাটে।

সেখান থেকে একটি চটি বই এমন এক লোক কিনল, যার বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। সে জানেও না যে বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। বরং সে অনুবাদ ছাড়া ইংরেজিও পড়তে পারে না। আর এই বই কেনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই বিজ্ঞানী ও তার অনুসারীর ওপর ফুলে উঠছেন, ফুঁসে উঠছেন, বলে উঠছেন এটা কোনো দর্শন হতে পারে? এই ব্যক্তিকে অনুসরণ করা যায়? ইত্যাদি, ইত্যাদি!

এই ব্যক্তি যেমন বিজ্ঞানীদের কাছে হাসির পাত্র, তেমনি বন্ধু আপনাকে অনুরোধ, আপনি এমন হাসির পাত্র হবেন না।

এবার আরেকটি বিষয় দেখা যাক। যেহেতু মাযহাবী লা-মাযহাবী সবাই তাকলীদ করে এবং সবাই যার যার গবেষক-মুফতীর গবেষণা ও মাযহাব মানে, তাই এবার ভেবে দেখা যাক, কার মাযহাব অনুসরণের বেশি উপযুক্ত। এক্ষেত্রে একবাক্যে সকল বিবেকবান একই কথা বলবেন যে, যারা বেশি প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারাই অনুসরণের বেশি উপযুক্ত। তাদের সঠিক সমাধান পাওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় বেশি।

যারা চার মাযহাবের অনুসারী তারা তাদের ইমামকে মানে। যারা তাদেরকে মানে না, তারা তাদের শায়েখদেরকে মানে। এবার দেখি, ইমাম মালেক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আহমদ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. বেশি প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, নাকি এসব শায়েখ বেশি অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। কুরআন হাদীস চার ইমাম বেশি জানতেন, নাকি বর্তমানকার আলবানী মরহুম বেশি জানতেন? কুরআন হাদীসের গভীর জ্ঞান কাদের বেশি ছিল? কোন্ হাদীস সহীহ, কোন্ হাদীস সহীহ না, কোন্ আয়াত ও হাদীস মানসূখ, কোন্ আয়াত ও হাদীস মানসূখ না, কোন্ আয়াতের ও হাদীসের কী অর্থ, সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে কারা বেশি জানতেন? ইমাম মালেক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আহমদ রহ. ও ইমাম আবু হানীফা রহ. নাকি আলবানী রহ. ড. গালিব ও এ যুগের গবেষকরা?

ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির তথা সমগ্র উম্মতের আলেম-উলামা ও জনসাধারণের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও কর্মের আলোকে চার ইমামসহ সালাফের অন্যান্য ইমামের সঙ্গে বর্তমান যুগের কোনো গবেষকের তুলনা করা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়, বরং এটি তাদের সঙ্গে বেয়াদবিও বটে। তারা তো ছিলেন বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মেধাশক্তি, উদ্ভাবন শক্তি প্রভৃতির পাহাড়। কুরআন-হাদীস, ফিকহ-তাফসীর, সাহাবী-তাবেয়ীর বক্তব্য, ফতোয়া, কর্ম ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞানের মহাসমুদ্র। সব কিছুই তাদের ছিল নখদর্পণে। তাই তাদের সঙ্গে বর্তমানের কাউকে তুলনা করা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। ওই ভাইয়েরা যেহেতু চার ইমাম ও সালাফের

ফকীহদের সঙ্গে তাদের গবেষকদের তুলনা করে থাকেন, তাই শুধু বোঝানোর খাতিরে ইমামদের সঙ্গে এসব গবেষকের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। অন্যথায় বর্তমান গবেষক ও তাদের গবেষণা সালাফের ইমাম ও তাদের গবেষণার সঙ্গে তুলনা করাও ভুল।

একজন মুজতাহিদ (গবেষক) ফকীহের জন্য কী কী যোগ্যতা ও গুণাগুণ জরুরি সে সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন-

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُفْتِيْ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِلَّا رَجُلًا عَارِفًا بِكِتَابِ اللهِ: بِنَاسِخِه وَمَنْسُوْخِه، وَبِمُحْكَمِه وَمُتَشَابِهِه، وَتَأْوِيْلِه وَتَنْزِيْلِه، وَمَكِّيِّه وَمَدَنِيِّه، وَمَا أُرِيْدَ بِه، وَفِيْمَا أُنْزِلَ، ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَصِيْرًا بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ، وَيَعْرِفُ مِنَ الْحَدِيْثِ مِثْلَ مَا عَرَفَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَكُوْنُ بَصِيْرًا بِاللُّغَةِ، بَصِيْرًا بِالشِّعْرِ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ، وَيَسْتَعْمِلُ مَعَ هٰذَا الْإِنْصَافَ، وَقِلَّةَ الْكَلَامِ، وَيَكُوْنُ بَعْدَ هٰذَا مُشْرِفًا عَلَى اخْتِلَافِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَيَكُوْنُ لَهُ قَرِيْحَةٌ بَعْدَ هٰذَا، فَإِذَا كَانَ هٰذَا هٰكَذَا فَلَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيُفْتِيَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هٰكَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ وَلَا يُفْتِيَ.

অর্থাৎ ওই ব্যক্তির ফতোয়া দেওয়া বৈধ, যে কুরআন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী, কোন্ আয়াত নাসেখ, কোন্টি মানসূখ, কোন্টি মুহকাম, কোন্টি মুতাশাবিহ, কোন্ আয়াতের কী অর্থ ও ব্যাখ্যা, কোন্টি মক্কী, কোন্টি মাদানী, কোন্ আয়াতের কী উদ্দেশ্য এবং নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট কী। অনুরূপ হাদীস সম্পর্কেও এমন পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকতে হবে। কুরআনের যেসব বিষয় জেনেছে, তেমনিভাবে হাদীসেরও সেসব বিষয় জানবে। আরবী ভাষা, আরবী কাব্য এবং কুরআন হাদীস বুঝতে যত শাস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো সম্পর্কে তীক্ষ্মজ্ঞানসম্পন্ন হবে। নিজ গবেষণার ক্ষেত্রে ইনসাফ পরায়ণ হবে। কথা কম বলবে। এসব কিছুর পর সবযুগের ও সবঅঞ্চলের উলামায়ে কেরামের মতামত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হবে। এসবের পাশাপাশি সে স্বচ্ছ-সুন্দর-তীক্ষ্ম

মেধা ও বোধসম্পন্ন হবে। কোনো ব্যক্তি যদি এসব যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী হয়, তাহলে তার জন্য হালাল-হারামের বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া বৈধ হবে। যে এমন নয়, তার জন্য এক্ষেত্রে কোনো কথা বলারই অধিকার নেই। কিতাবুল ফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩৩২

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর এই বক্তব্য এবং আরো কয়েকজন ইমামের একই ধরনের বক্তব্য উল্লেখ করার পর আল্লামা খতীব বাগদাদী রহ. লেখেন-

قُلْتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ قَوِيَّ الْاِسْتِنْبَاطِ جَيِّدَ الْمُلَاحَظَةِ، رَصِيْنَ الْفِكْرِ، صَحِيْحَ الْاِعْتِبَارِ، صَاحِبَ أَنَاةٍ وَتُؤَدَةٍ، وَأَخَا اسْتِثْبَاتٍ، وَتَرْكِ عَجَلَةٍ، بَصِيْرًا بِمَا فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ، مُسْتَوْقِفًا بِالْمُشَاوَرَةِ، حَافِظًا لِدِيْنِهِ، مُشْفِقًا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ، مُوَاظِبًا عَلَى مُرُوْءَتِهِ، حَرِيْصًا عَلَى اسْتِطَابَةِ مَأْكَلِهِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّوْفِيْقِ، مُتَوَرِّعًا عَنِ الشُّبُهَاتِ، صَادِفًا عَنْ فَاسِدِ التَّأْوِيْلَاتِ، صَلِيْبًا فِي الْحَقِّ، دَائِمَ الْاِشْتِغَالِ بِمَعَادِنِ الْفَتْوٰى، وَطُرُقِ الْاِجْتِهَادِ وَلَا يَكُوْنُ مِمَّنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ، وَاعْتَوَرَهُ دَوَامُ السَّهْرِ، وَلَا مَوْصُوْفًا بِقِلَّةِ الضَّبْطِ، مَنْعُوْتًا بِنَقْصِ الْفَهْمِ، مَعْرُوْفًا بِالْاِخْتِلَالِ، يُجِيْبُ بِمَا لَا يَسْنَحُ لَهُ، وَيُفْتِي بِمَا يَخْفَى عَلَيْهِ، وَتَجُوْزُ فَتَاوَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَمَنْ لَمْ تُخْرِجْهُ بِدْعَتُهُ إِلَى فِسْقٍ، فَأَمَّا الشُّرَاةُ وَالرَّافِضَةُ الَّذِيْنَ يَشْتِمُوْنَ الصَّحَابَةَ، وَيَسُبُّوْنَ السَّلَفَ الصَّالِحَ، فَإِنَّ فَتَاوِيْهِمْ مَرْذُوْلَةٌ، وَأَقَاوِيْلَهُمْ غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ وَفِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يُفْتِيَ تَنْبِيْهٌ عَلَى مَنْ لَا تَجُوْزُ فَتْوَاهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلُوْمَ كُلَّهَا أَبَازِيْرُ الْفِقْهِ، وَلَيْسَ دُوْنَ الْفِقْهِ عِلْمٌ إِلَّا وَصَاحِبُهُ يَحْتَاجُ إِلَى دُوْنَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْفَقِيْهُ، لِأَنَّ الْفَقِيْهَ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِطَرَفٍ مِنْ مَعْرِفَةِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْجِدِّ وَالْهَزْلِ، وَالْخِلَافِ وَالضِّدِّ، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ، وَأُمُوْرِ النَّاسِ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ، وَالْعَادَاتِ الْمَعْرُوْفَةِ مِنْهُمْ فَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي النَّظَرُ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَنْ

يُدْرِكَ ذٰلِكَ إِلَّا بِمُلَاقَاةِ الرِّجَالِ، وَالْاِجْتِمَاعِ مِنْ أَهْلِ النِّحَلِ وَالْمَقَالَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَمُسَاءَلَتِهِمْ، وَكَثْرَةِ الْمُذَاكَرَةِ لَهُمْ، وَجَمْعِ الْكُتُبِ، وَدَرْسِهَا، وَدَوَامِ مُطَالَعَتِهَا.

অর্থাৎ এসবের সঙ্গে আরো আবশ্যক তিনি হবেন শক্তিশালী উদঘাটন-যোগ্যতা-সম্পন্ন, স্বচ্ছ-চিন্তাশীল, পরিশুদ্ধ কিয়াস-সম্পন্ন, দৃঢ় ও ধীরস্থির, দ্রুততা বর্জনকারী, মানুষের কল্যাণ কোন্টিতে সে সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিশালী, অন্য আলেমদের সঙ্গে সদা মতবিনিময়কারী, নিজের দ্বীনের হেফাযতকারী, দ্বীনী ভাইদের প্রতি দয়াশীল, আদব, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সদা যত্নশীল, হালাল গ্রহণে অধীর আগ্রহী, কেননা এটি তাওফীকের প্রথম শর্ত, সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে সদাবিরত, বাতিল মতবাদ-বিমুখ, সত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়, ফতোয়া ও গবেষণা ভাণ্ডারে সদা ডুবন্ত; তিনি এমন হতে পারবেন না, যার মধ্যে অলসতা, বোধহীনতা প্রবল, সংরক্ষণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কম, মস্তিষ্ক বিকৃত, যা তার কাছে পরিষ্কার নয়, তারও জবাব দিয়ে দেয়; যে বিষয় এখনো তার বুঝে আসেনি সে ক্ষেত্রে ফতোয়া দিয়ে দেয়।

এরপর খতীব বাগদাদী রহ. বলেন, এসব যোগ্যতা শাস্ত্রজ্ঞদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য, তাদেরকে বারবার জিজ্ঞাসা এবং তাদের সঙ্গে অধিক আলোচনা, কিতাব সংগ্রহ ও সর্বদা সেগুলোর পাঠ ছাড়া কিছুতেই অর্জিত হবে না। প্রাগুক্ত ২/৩৩৪

এবার আমরা একটু ভাবি, একজন মুজতাহিদ মুফতীর জন্য আবশ্যকীয় যেসব গুণ ও যোগ্যতার কথা ইমাম শাফেয়ী রহ. ও খতীব বাগদাদী রহ. বললেন, এসব গুণ ও যোগ্যতা কার বেশি, চার ইমামের নাকি বর্তমানের শায়েখদের?

কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা, নাসেখ-মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, কোন আয়াতের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট কী; তেমনি হাদীসের অর্থ, ব্যাখ্যা, নাসেখ-মানসূখ, কোন হাদীসের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট কী; তেমনিভাবে আরবী ভাষাজ্ঞান, আরবী কাব্য ইত্যাদি সম্পর্কে কারা বেশি জানতেন, কারা গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন চার ইমাম নাকি বর্তমানকার শায়েখ ও ডক্টরগণ?

অনুরূপ তীক্ষ্মমেধা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, উদঘাটনের শক্তিশালী যোগ্যতা, দৃঢ়তা, স্থিরতা, দ্বীনদারি, ভদ্রতা ও আদব-আখলাকের যত্নশীলতা, পাশাপাশি শাস্ত্রজ্ঞদের দীর্ঘ সান্নিধ্য ও সাহচর্য, তাদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে কারা অগ্রগামী, চার ইমাম নাকি বর্তমানের গবেষকগণ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ ও সরল এবং সেটিই বাস্তব। তাই চার ইমামের পর মানুষ নতুন মুফতীর কাছে না গিয়ে তাদের ফতোয়াগুলোই অনুসরণ করে আসছে। কারণ, পরের গবেষকগণ চার ইমামের চেয়ে অগ্রগামী নন।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু বকর আলইসমাঈলী (মৃত্যু ৩৭১ হি.)-এর হাদীস সংকলন দেখে বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ হাফেয যাহাবি রহ. বলেন-

اِبْتَهَرْتُ بِحِفْظِ هٰذَا الْإِمَامِ وَجَزَمْتُ بِأَنَّ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ إِيَاسٍ مِنْ أَنْ يَلْحَقُوا الْمُتَقَدِّمِيْنَ فِي الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ.

'আমি তার যোগ্যতা ও স্মরণশক্তি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছি এবং আমি নিশ্চিত, পরবর্তীরা হাদীস শাস্ত্রে জানাশোনা ও মুখস্থে পূর্ববর্তীদের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না।' তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১০৬

হাফেয ইসমাঈলী রহ. চতুর্থ শতাব্দীর। তার ক্ষেত্রে যদি অষ্টম শতাব্দীর হাফেয যাহাবী রহ. এমন সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে যারা আরো আগের জগদ্বিখ্যাত ইমাম, তাদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কী হবে! আরো একটি বিষয়, হাফেয যাহাবী রহ.ও বিখ্যাত একজন হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ। তিনি ও তার যুগের লোকও যদি পূর্ববর্তী লোকের কাছে-ধারেও না যেতে পারে, তাহলে যারা হাফেয যাহাবীর প্রায় সাতশ বছর পরের, তারা কীভাবে পূর্ববর্তীদের ধারে-কাছে যেতে পারবে?

এই চার ইমামের পর পৃথিবীর সকল মুসলমান, সকল আলেম-উলামা, সকল মুহাদ্দিস, সকল মুফাস্সির, সকল ফকীহ, সকল কারী তথা কেরাত শাস্ত্রের আলেম, সকল ইতিহাসবিদ, সকল হাদীস ব্যাখ্যাতা মোটকথা ইসলামী সকল শাস্ত্রের আলেম (নিতান্তই সামান্য কয়েকজন ছাড়া) সবাই এই চার ইমামেরই অনুসারী ছিলেন।

যদি কারো দালিলিক আলোচনা-পর্যালোচনা তেমন ভালো না লাগে, তাহলে তার জন্য এই সরল সূত্রই যথেষ্ট এবং যেকোনো বিবেকবান বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, পৃথিবীর সকল শ্রেণি ও শাস্ত্রের সকল আলেম-উলামা একসঙ্গে সবাই কি ভুল করতে পারেন?

সকল আলেম-উলামার ও সকল সাধারণ মুসলমানের হাজার বছরেরও অধিক এসব ইমামের ফতোয়া বরণ ও পালন করে আসাই বলতে গেলে অকাট্য প্রমাণ যে, এসব মাযহাব সঠিক ও সত্য।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ওই ভাইয়েরা বারবার এই বুলি আওড়ান, 'ইমামরা তো মানুষ, তারা তো ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাদের ভুল হতে পারে।' তারা এসব কথা এমনভাবে এবং এত বেশি বলে, মনে হয় যেন ইমামগণ শুধু ভুলই করেছেন। আর তাদের যেসব 'ইমাম' আছেন, যেমন আলবানী ও বিন বায মরহুম, তারা মানুষ থেকে ভিন্ন, তারা ভুলের ঊর্ধ্বে। তাদের কোনো ভুল হতে পারে না।

হলেও তা নিতান্তই সামান্য।

আগে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। মানুষ হিসেবে সব মানুষেরই ভুল হতে পারে। আর যে শাস্ত্রে যে যত যোগ্য তার ভুলও তত কম। যে যত কম যোগ্য তার ভুল তত বেশি হয়। সে হিসেবে চার ইমামের ভুলের আশঙ্কা পরবর্তীদের তুলনায় কম। তারপরও যেহেতু প্রায় হাজার বছরের অধিক চার মাযহাব চর্চিত হয়ে আসছে, হাজারো পণ্ডিত আলেম মাযহাবের প্রতিটি মাসআলা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আসছেন এবং বিশ্লেষণে যে ফতোয়া ভুল মনে হয়েছে তা বাদ দিয়ে সঠিক মত গ্রহণ করেছেন, তাই মাযহাবের ভুলগুলো চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে এবং সঠিক মত গ্রহণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এই সুযোগটি বর্তমানের শায়েখদের গবেষণার ক্ষেত্রে হয়নি।

জানা কথা, আলবানী মরহুম ও ড. গালিবদেরও ভুল হতে পারে, বরং পূর্ববর্তী ইমামদের তুলনায় তাদের ভুল হওয়ার আশংকা আরো বেশি।

এদের ভক্তরা এদের 'গবেষণাকে' স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করেনি এবং এদের ভুল চিহ্নিত করেনি।

এবার একজন সুস্থ বিবেকবান মুসলমানের সহজ-সরলভাবে ভাবা দরকার, তিনি এই দুইয়ের কোন মাযহাবটি গ্রহণ করবেন?

একজন মুসলমান তার মাসআলাগত সকল ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদ ফকীহের শরণাপন্ন হওয়াকে তাকলীদে শাখছী বলে। যেমন, কেউ তার মাসআলাগত সকল ক্ষেত্রে ইমাম মালেক রহ.-এর শরণাপন্ন হয়, কেউ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শরণাপন্ন হয়, কেউ ইমাম আহমদ রহ.-এর, কেউ ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর, কেউ আবার নাসের আলবানী রহ.-এর, কেউ বিন বায রহ.-এর বা মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীনের। তো মাসআলাগত সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট একজনের শরণাপন্ন হয়ে তার ফতোয়ামতো আমল করাকে তাকলীদে শাখছী তথা নির্দিষ্ট এক মুফতীর ফতোয়া অনুসরণ করা বলে।

ওপরের সবই তাকলীদে শাখছী। কোনো কোনো ভাই এই তাকলীদ নিয়েও সংশয় প্রকাশ করে। তাই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

একজন মুসলমান তার সকল মাসআলায় নির্দিষ্ট একজন মুফতীর কাছে জিজ্ঞেস করলে এতে শরীয়তগত কোনো অসুবিধা নেই। বিবেকের দৃষ্টিতেও এতে নিন্দার কিছু নেই। শরীয়তের কোনো দলিলে এটা নেই, কোনো মুসলমান তার সকল মাসআলা নির্দিষ্ট এক মুফতীর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারবে না। তাকে এক মাসআলায় এই মুফতীর কাছে আরেক মাসআলায় আরেক মুফতীর কাছে, এভাবে একজনকে বহু মুফতীর কাছে যেতে হবে। শরীয়ত তো পরের কথা এটা বিবেকের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং শরীয়তের দলিল থেকে এর বিপরীতটিই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ নিজের সকল মাসআলা নির্দিষ্ট এক মুফতীকে জিজ্ঞেস করলে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার যে প্রধান দায়িত্বসমূহ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল প্রত্যেক অঞ্চলে কাযী তথা বিচারক নির্ধারণ করে দেওয়া। যাতে এলাকার প্রতিটি মানুষের সকল মামলা-মোকাদ্দমা তার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে এবং ঝগড়া-বিবাদ দূরীভূত হয়ে শান্তি অটুট থাকে। এক এলাকার জন্য একজন কাযী বা বিচারক নির্ধারণ করা মানেই হল ওই এলাকার প্রতিটি মানুষ তার মামলা-মোকদ্দমা-সংক্রান্ত

সকল বিষয় ওই এক কাযীর কাছে উত্থাপন করবে। আর কাযী সাহেব কুরআন হাদীস গবেষণা করে সঠিক সমাধান বের করে সে অনুযায়ী ফয়সালা করবে এবং সে ফয়সালা তারা মানবে, বরং মানতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং এখানে এ-সংক্রান্ত সকল মাসআলায় একজনকে মানা হল, বরং এই একজনকেই মানতে সবাই বাধ্য। ইসলামী খেলাফতের সকল যুগে সকল এলাকারই সর্বদা কাযী নিযুক্ত ছিল। তাহলে সকল মানুষ সেসব যুগে তাদের একজনকেই মেনে আসছিল।

এ তো গেল বিচার প্রসঙ্গ। খোদ ফতোয়ার ক্ষেত্রেও ইসলামী খেলাফতের আমীর বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ফতোয়ার জন্য নির্ধারিত করতে পারেন এবং যারা ফতোয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য, তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন। ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে এভাবে আমল চালু হয়ে আসছে।

উমর রা. যখন তার খেলাফতকালে শাম দেশে যান, তখন সেখানে জনসাধারণের সামনে ঘোষণা দেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْأَلَ الْفِقْهَ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

‘যার মাসআলা জানার প্রয়োজন সে যেন মুআয বিন জাবালের কাছে জিজ্ঞেস করে।’

আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.-এর সময় হজের মৌসুমে ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হয়-

أَلَا لَايُفْتِي النَّاسَ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ.

'মানুষকে ফতোয়া একমাত্র আতা ইবনে আবী রাবাহই দেবেন। তিনি না থাকলে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী নাজীহ দেবেন।' সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৪২৫

এমন ঘোষণা ইমাম মালেক রহ.-এর সময় ইমাম মালেক রহ.-এর ক্ষেত্রেও দেওয়া হত। বর্তমানে সৌদি আরবেও এভাবে আমল হচ্ছে, ফতোয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ফতোয়া বিভাগ ও বোর্ড বানানো হয়েছে। শায়েখ বিন বায মরহুম এ ধরনের বোর্ডেরই এক সময়কার প্রধান।

জানা কথা, যে অঞ্চলে যে মুফতী নিযুক্ত হন সে অঞ্চলের মানুষ তাদের মাসআলার ক্ষেত্রে সে মুফতীরই শরণাপন্ন হয় এবং সকল মাসআলার ক্ষেত্রে তাকেই মানে। এসব দলিল থেকে বোঝা যায়, সব মাসআলার ক্ষেত্রে একজন থেকে জিজ্ঞেস করলে কোনো অসুবিধা নেই। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা আবশ্যক।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে যদি ভাবি, একজন মানুষ তার মাসআলাগত সব বিষয় শায়েখ আলবানী রহ.-এর কাছে জিজ্ঞেস করে এবং তার ফতোয়ামতো চলে। তাহলে আশা রাখি, ওসব ভাইয়ের এই ক্ষেত্রে দুঃখ হওয়ার কথা নয়, বরং খুশিই হবেন এবং এতে তাদের কোনো সংশয় থাকে না। বরং তারা এটাই চান, পৃথিবীর সকল মুসলমান সকল মাসআলায় শায়েখ আলবানী রহ.কে জিজ্ঞেস করুক এবং তার ফতোয়ামতো চলুক। কিন্তু এটা যে তাকলীদে শাখছী হয়ে গেল, তা তাদের কল্পনায়ও আসে না। শায়েখ আলবানী রহ. থেকে হাজার গুণ বড় ইমাম মালেক রহ. ইমাম আহমদ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.কে মানলেই কি তাকলীদে শাখছীর হুলস্থূল কা- ঘটে যায়!

বাকি, প্রশ্ন হতে পারে 'শুধু এক ফকীহের অনুসরণ করলে তার তো ভুলও হতে পারে', তাহলে তার ভুল মোতাবেক আমল হয়ে যাবে।

ভালো কথা, বেশ মুখরোচক। কিন্তু স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার, একই কথা সমানভাবে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে সোনালি যুগের সোনালি ইমাম, যারা হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে পুরো বিশ্বের সকল আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস তথা ইসলামী সকল শাস্ত্রজ্ঞের কাছে বরণীয় ইমাম, তাঁদেরকে বাদ দিয়ে সদাসর্বদা বর্তমানকালের শায়েখ আলবানীর ফতোয়ার অনুসরণ করে। কিন্তু আফসোস ওই ভাইদের ওপর! তারা এই বুলি এমনভাবে আওড়ায়, মনে হয় শুধু চার ইমামই এই বুলির আওতায়, শায়েখ আলবানী বা তাদের মতাদর্শের কেউই এর আওতাধীন নয়। বরং তাদের ক্ষেত্রে এটা কল্পনায়ও আসে না।

তবে ওই কথা ঠিক যে, ওই ফকীহেরও ভুল হতে পারে। কিন্তু এই সমস্যা এড়ানোর জন্য আমরা অন্য যে ফকীহের কাছে যাব, তারও তো ভুল হতে পারে। তাহলে সমস্যা তো আপন জায়গায় রয়েই গেল। তাই এটা কোনো সমাধান নয়, বরং সমাধান হল কোনো ফতোয়ায় যদি ফকীহের ভুল প্রমাণিত হয়, তার ফতোয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য দলিল-প্রমাণ না থাকে, সাহাবী তাবেয়ীনসহ সবযুগের আমল ও ফতোয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিপরীত হয়, তাহলে সে ফতোয়া পরিত্যাজ্য হবে। নিজের মুফতীর প্রতি টানের কারণে তার ওপর আমল করা যাবে না, ওই মুফতী চার ইমাম হোক বা 'কোনো শায়েখ' হোক বা অন্য কেউ। এ ছাড়া তার বাকি সব মাসআলায় ও ফতোয়ায় তাকে অনুসরণ করা যাবে এবং তাতে দোষের কিছু নেই।

যাই হোক, সব মাসআলার ক্ষেত্রে সর্বদায় একজন প্রাজ্ঞ মুফতীর কাছে জিজ্ঞেস করলে এতে শরীয়ত ও বিবেকগত কোনো অসুবিধা নেই।

এ তো গেল বিষয়টির দলিলগত বিশ্লেষণ। এবার আসি ইতিহাসগত বিশ্লেষণে।

আমাদের যতটুকু জানা আছে, নবীজীর যুগ থেকে এই পর্যন্ত সব যুগে সব এলাকায় তাকলীদে শাখছীর পথ ধরেই মাসআলা-মাসায়েল ও ফতোয়া-ফারায়েয চালু রয়েছে। যেখানে নবীজী ছিলেন সেখানে তিনি নিজেই ফতোয়া দিতেন, কিন্তু যেখানে তিনি ছিলেন না, বরং তাঁর সাহাবীগণের কাউকে সেখানে প্রেরণ করেছেন তাদের দ্বীন শেখানোর জন্য, স্পষ্ট কথা যে, সেখানকার লোকজন দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে ওই সাহাবীর নির্দেশনা ও ফতোয়া মতেই চলতেন। তারা অন্য কাউকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন না।

উদাহরণস্বরূপ, হযরত মুআয রা.কে পাঠানো হয় ইয়ামানে। স্পষ্টতই ইয়ামানবাসী তাদের দ্বীনী সকল ক্ষেত্রে হযরত মুআয রা.কেই মানবে এবং তার কাছ থেকেই ফতোয়া গ্রহণ করবে। এটাই স্বাভাবিক এবং বাস্তব। এটা হতে পারে না, তাদের কেউ হযরত মুআয রা.কে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। তেমনিভাবে হযরত আলী রা.কেও পাঠানো হয় ইয়ামানে, সেখানেও একই কথা।

মোটকথা, যে সাহাবীকে নবীজী যেখানে পাঠিয়েছেন সে সাহাবী সে এলাকার মুফতী। সে এলাকার লোকজন তাঁর কাছ থেকেই ফতোয়া জানত এবং সে মোতাবেক চলত। তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের নির্বাচিত শিষ্য, যাদেরকে তাঁরা ফতোয়া ও মাসআলাসমূহ ভালোভাবে শিখিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন, তাদের কাছেই মানুষ ফতোয়া জানত। এভাবে পরবর্তী প্রজন্ম এবং তার পরবর্তী প্রজন্ম। এটা বাস্তব ইতিহাস। এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়।

একবার খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. তাঁর খেলাফতের অধীন সবাইকে এবং সব অঞ্চলের সৈন্যদেরকে (দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে) এক নিয়মে আনতে চান। (অর্থাৎ ওই নিয়মের পরে তার বিপরীত কোনো মত বা নিয়ম চলবে না।) কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি ওই ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং বলেন-

إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَجُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ فِيهِمْ قُضَاةٌ، قَضَوْا بِأَقْضِيَةٍ أَجَازَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَضُوا بِهَا، وَأَمْضَاهَا أَهْلُ الْمِصْرِ، كَالصُّلْحِ بَيْنَهُمْ، فَهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.

> অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুসলিম অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চলেই এবং প্রতিটি সৈন্যবাহিনীতে নবীজীর কোনো না কোনো সাহাবী ছিলেন এবং তাদের মাঝে বিচারকগণ ছিলেন, যারা বিভিন্ন ফয়সালা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম সেগুলো সমর্থন ও সত্যায়িত করেছেন। ফলে সে অঞ্চলের সবাই তা যুগ যুগ ধরে চুক্তি-পত্রের মতো মেনে আসছে। সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চলের লোক সে আমল ও নিয়মেই থাকবে, যা তারা আগে থেকে করে আসছিল। তারীখে আবু যুরআ আদ্দিমাশকী ১/২০২

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর এই কথা দ্বারাও সুস্পষ্ট, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকজন তাদের অঞ্চলের আগত সাহাবীর তাকলীদে শাখছী করে আসছিল।

খলীফা মানসূর একবার হজে আসেন। তখন ইমাম মালেক রহ.কে তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা, পুরো রাজ্যের সবাইকে এক মাযহাবের ওপর নিয়ে আসা। সবাই এই মাযহাবের ওপর আমল করবে। এর বিপরীত করলে গর্দান উড়িয়ে দেব। আর তা হল, আমি আপনার মুআত্তা কিতাব কাবা ঘরে ঝুলিয়ে দেব। চতুর্দিকে এর কপি প্রেরণ করে দেব। সবাইকে এই অনুযায়ী আমলে বাধ্য করব। বিচারকদেরকেও এই মোতাবেক বিচার করতে বলব। তখন ইমাম মালেক রহ. বলেন-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَكَانَ يَبْعَثُ السَّرَايَا وَكَانَ يَخْرُجُ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنَ الْبِلَادِ كَثِيْرًا حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَهُ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنَ الْبِلَادِ كَثِيْرًا، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَهُمَا فَفُتِحَتِ الْبِلَادُ عَلَى يَدَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ يَبْعَثَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمِيْنَ فَلَمْ يَزَلْ يُؤْخَذُ عَنْهُمْ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ إِلَى يَوْمِهِمْ هٰذَا، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُحَوِّلُهُمْ مِمَّا يَعْرِفُوْنَ إِلَى مَا لَا يَعْرِفُوْنَ رَأَوْا ذٰلِكَ كُفْرًا وَلٰكِنْ أَقِرَّ أَهْلَ كُلِّ بَلْدَةٍ عَلَى مَا فِيْهَا مِنَ الْعِلْمِ وَخُذْ هٰذَا الْعِلْمَ لِنَفْسِكَ، فَقَالَ لِيْ: مَا أَبْعَدْتَ الْقَوْلَ! اُكْتُبْ هٰذَا الْعِلْمَ لِمُحَمَّدٍ.

‘নবীজী এই উম্মতের মাঝে ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের মাঝে।) তিনি কখনো সৈন্যদল পাঠাতেন, কখনো সঙ্গে নিজেও বের হতেন। এভাবে সামান্য কিছু অঞ্চল বিজিত হয়। এরপর নবীজীর ওফাত হয়ে যায়। এর পর খলীফা হন আবু বকর রা.। তাঁর সময়ও খুব বেশি অঞ্চল বিজিত হয়নি। কিন্তু যখন উমর রা. খলীফা হন, তখন অনেক শহর ও অঞ্চল তাঁর হাতে বিজিত হয়। তিনি সেসব অঞ্চলে নবীজীর সাহাবীদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য প্রেরণ করেন। (তারা প্রত্যেকে স্ব স্ব অঞ্চলে দ্বীন শেখান।) সেসব সাহাবী যেভাবে তাদেরকে দ্বীন শিখিয়েছেন, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকজন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সেভাবেই মেনে আসছে। এখন যদি আপনি তাদেরকে তারা যা জানে (অর্থাৎ সাহাবী থেকে তারা যা শিখেছে) তা থেকে হটিয়ে এমন কিছু দিতে চান, যা তারা জানে না, তাহলে তারা একে কুফুরির মতো মনে করবে। (অর্থাৎ তা থেকে তারা সরবে না, ফলে বিশৃঙ্খলা বা বিদ্রোহ হবে।) সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের তাদের স্ব স্ব ফতোয়ার ওপর রাখুন। আর আমার কিতাব আপনি নিজের জন্য রাখুন। তখন খলীফা বললেন, আপনি খুব দূরদর্শী কথা বলেছেন। ঠিক আছে, এটা আমার ছেলে মুহাম্মদ-এর জন্য রাখুন।’
তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত-তাদীল ১/২৯

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. ও ইমাম মালেক রহ-এর কথা থেকে পরিষ্কার, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকেরা তাদের স্ব স্ব সাহাবীরই তাকলীদে শাখছী করে আসছে। অর্থাৎ তাঁর ফতোয়াগুলো মেনে আসছে।

আগে আমরা ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর দীর্ঘ একটি বক্তব্য তুলে ধরেছি। সেটিও এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সাহাবীর যুগ থেকেই তাকলীদে শাখছীর ধারা শুরু হয়েছে। তাই পুনরায় সে বক্তব্যটি পৃষ্ঠা ৩৮-৪২ দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর কথা থেকেও স্পষ্ট, মদীনার লোকেরা যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.-এর সময় এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে তাঁরই তাকলীদে শাখছী করত, তেমনিভাবে মক্কার লোকেরা ইবনে আব্বাস রা.-এর এবং কুফার লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর তাকলীদে শাখছী করত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা বলেন-

إِذَا حَدَّثَنَا الثِّقَةُ عَنْ عَلِيٍّ لَانَعْدُوْهَا.

‘যদি বিশ্বস্ত সূত্রে হযরত আলী রা. থেকে কোনো ফতোয়া পাই, তাহলে আমরা তার বাইরে যাই না। (অর্থাৎ সেটাই গ্রহণ করি)।’

আগে উল্লেখ করা হয়েছে হজের সময় ঘোষণা করা হত-

لَايُفْتِي النَّاسَ إِلَّا عَطَاءٌ.

‘একমাত্র আতা ইবনে আবী বারাহ রহ.-ই ফতোয়া দেবে।’ সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৪২৫

উমর রা. যখন শাম দেশে যান তখন জনসাধারণের সামনে ঘোষণা দেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْأَلَ الْفِقْهَ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

‘কেউ যদি মাসআলা জানতে চায়, তাহলে সে মুআয ইবনে জাবালকে জিজ্ঞেস করবে।’ তারীখে ইবনে আসাকির ৪২১

এ সবই তাকলীদে শাখছী।

মুজাহিদ রহ. বলেন-

> كُنَّا نَفْخَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ: بِفَقِيْهِنَا وَقَاضِيْنَا وَمُؤَذِّنِنَا وَقَارِئِنَا، فَأَمَّا فَقِيْهُنَا فَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا مُؤَذِّنُنَا فَأَبُوْمَحْذُوْرَةَ، وَأَمَّا قَارِئُنَا فَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ، وَأَمَّا
> قَاضِيْنَا فَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ.

অর্থাৎ আমরা অন্য অঞ্চলের লোকদের ওপর চারটি বিষয় নিয়ে গর্ব করি

এক. আমাদের ফকীহ তথা মুফতী নিয়ে, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.; আমাদের মুআয্যিন নিয়ে, তিনি হলেন আবু মাহযুরা রা.; আমাদের কারী নিয়ে, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়িব রা.; আমাদের কাযী নিয়ে, তিনি হলেন উবায়েদ ইবনে উমায়ের রা.। তবাকাতে ইবনে সা'দ ৪/২২০

এ বক্তব্যও স্পষ্ট যে, মক্কার লোকেরা সবাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.কেই মানতেন।

ইতিহাসের কিতাবে এ ধরনের বহু তথ্য আছে। ইসলামী ফিকহে যত বড় বড় মুফতী ছিলেন, তাদের ইতিহাস পড়লেই সহজে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। এসব থেকে পরিষ্কার, ওই সময়ও তাকলীদে শাখছী ছিল, বরং তাকলীদে শাখছীই ছিল। আর এটাই সহজাত ও স্বভাবজাত এবং বিবেকেরও দাবি।

কেউ কেউ বলে থাকেন, চার ইমামের পরই কেবল তাকলীদে শাখছী চালু হয়। এর আগে তাকলীদে শাখছী ছিল না। মূলত, এর উৎস হল তাদের আগের অনুমান যে, চার ইমামের পর থেকেই মাযহাব শুরু হয়। এর আগে মাযহাব ছিল না। এর কারণ হল, তারা চার মাযহাব এই চার ইমামের নামে শুনে থাকে, আগের কারো নামে নয়। তাই মনে করে আগে মাযহাবও ছিল না। এটা ইতিহাস-অজ্ঞতা। অন্যথায় তাদেরকে বলতে হবে, হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের আগে কোনো হাদীস ছিল না। ছয়জনই এর সূচনাকারী (নাউযু বিল্লাহ!)। যে কয়জন কারীর কেরাত অনুসারে পুরো বিশ্বে কেরাত পাঠ হয়, তাদের আগে কোনো কেরাত ছিল না। এই কয়জন কারীই এসবের উদ্ভাবক (নাউযু বিল্লাহ!)।

স্থূলভাবে অনেকে মনে করে যে, চার ইমামের আগে কোনো তাকলীদে শাখছী ছিল না। বরং মানুষ এক মাসআলা নিজের অঞ্চলের মুফতীকে জিজ্ঞেস করত। আরেক মাসআলা অন্য অঞ্চলের মুফতীকে জিজ্ঞেস করত। এভাবে বহু মুফতীর কাছে যেত। কিন্তু কেউ এর কোনো দলিল পেশ করে না। মূলত এর কোনো দলিল পাবেও না। অথচ হাদীস-আছার ও ইতিহাসের কিতাবে বহু তথ্য এমন আছে, মদীনার লোক তাদের মুফতীদের বাদ দিয়ে অন্য অঞ্চলের কোনো মুফতীর ফতোয়া গ্রহণ করেনি। তেমনিভাবে মক্কা, কুফা, শাম প্রভৃতি অঞ্চলের লোকজনও। আগে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. ও ইমাম মালেক রহ.-এর কথায় আমরা তা স্পষ্টভাবে দেখেছি। আর এটা একজন বিবেকবান মানুষ বলেই বা কীভাবে?

এক মাসআলায় এক মুফতীকে জিজ্ঞেস করতে হবে আরেক মাসআলায় আরেক মুফতীকে। এভাবে তাকে বহু মুফতীর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। এটা তো বিবেকেও ধরে না।

যাই হোক, উল্লিখিত আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ইবনুল কায়্যিম রহ. খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. ইমাম মালেক রহ. এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয়, চার ইমামের আগে প্রত্যেক যুগেই তাকলীদে শাখছী ছিল। যারা বলে আগে তাকলীদে শাখছী ছিল না, তাদের কথা ভুল এবং ইতিহাস বিবর্জিত।

ওপরের ইতিহাস থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে গেল, যেদিন থেকে তাকলীদ শুরু সেদিন থেকে তাকলীদে শাখছীও শুরু। নবীজী যাকে যেখানে পাঠিয়েছেন সবাই তাকে অনুসরণ করত। নবীজীর ইন্তেকালের পর প্রত্যেক অঞ্চল স্ব স্ব সাহাবী ও মুফতীর শেখানো পদ্ধতির অনুসরণ করত। এভাবে পরবর্তী সময়ে চলতে থাকে। চার ইমামের পর সমগ্র মুসলমান চার ইমামকে অনুসরণ করে। এটা আগের সে অনুসরণের একটি ধাপমাত্র, যা আগে থেকে ধাপে ধাপে চলে এসেছে। বাকি, চার ইমামের অনুসরণের ধাপটি এমন সুবিস্তৃত, যা আগেরগুলোর ক্ষেত্রে হয়নি। এ-ই যা শুধু তফাত।

আমাদের ওই ভাইদের একটু ভাবার দরকার ছিল যে, চার ইমামের আগে যদি একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব মুফতীকে ছেড়ে বহু মুফতীর কাছে যেতে হত এবং নবীজীর যুগ থেকে সাহাবী তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ীর যুগে হাজার হাজার মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ বরং ইসলামের সবচেয়ে বিদ্বানদের যুগে যদি এই নিয়মই প্রচলিত হয়ে আসত, তাহলে চার ইমামের পর হঠাৎ করে মানুষকে কে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে যে, এখন শুধু একজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে? যে নিয়ম নবীজী, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী কর্তৃক স্বীকৃত ও সর্বত্র প্রচলিত, হঠাৎ করে তা কে বাদ দিয়ে দিল?

আগে ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্যে আমরা পড়েছি, যে অঞ্চলে যে ফতোয়া আগে থেকে চলে এসেছে সে অঞ্চলের লোকদের তা থেকে সরালে তারা একে কুফুরি মনে করতে পারে এবং তারা এই কারণে বিদ্রোহ করবে। সুতরাং তাদের দাবি অনুযায়ী যে নিয়মটি সোনালি যুগের সর্বত্র ও সবর্দা প্রচলিত হঠাৎ সব মানুষকে তা থেকে সরাতে কোনো সামান্যতম তর্ক-বিতর্কও হয়নি? অথচ তাদের কথা হিসেবে এটা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিষয় নয়, বরং সব অঞ্চলের সব মানুষের চর্চিত নিয়ম। তো সে নিয়ম থেকে মানুষকে ফেরাতে, বরং সেটা নিষিদ্ধ করতে তুমুল হাঙ্গামা ও লড়াই হওয়ার কথা ছিল। ইতিহাসে চার ইমামের যুগে এমন কোনো কিছুর সন্ধান কি তারা পেয়েছেন?

আচ্ছা, আগে থেকে যে অঞ্চলের সব মুসলমান যে নিয়ম চর্চা করে আসছে, নিশ্চয় তা নিষিদ্ধ করতে বড় ধরনের উদ্যোগ, শক্তিপ্রয়োগ কিংবা সে যুগের সমগ্র আলেমের কনফারেন্স করে ঐকমত্য গঠন করা আবশ্যক হবে। তো কোন্ কোন্ আলেম এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কোথায় তারা বৈঠক করেছেন, কখন তারা ঐকমত্যের ঘোষণা দিয়েছেনএ ধরনের কোনো তথ্য কি তাদের কাছে আছে? যদি এসব কোনো কিছুই না হয়ে থাকে অর্থাৎ শক্তিপ্রয়োগ বা আলেমের ঐকমত্যের কোনো উদ্যোগ না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কথা অনুযায়ী যুগ যুগ ধরে চলে আসা শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সমর্থিত নীতি কীভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে নতুন ধারা ও নিয়ম সৃষ্টি হল?

আচ্ছা, যদি মেনেও নেওয়া হয় চার ইমামের আগে তাকলীদে শাখছী ছিল না, চার ইমামের পরই নির্দিষ্ট এক ইমামের জিজ্ঞাসার প্রতি বাধ্যবাধকতা চলে আসে, তখন কথা হল সে বাধ্যবাধকতা জনসাধারণ তো বটেই, চার ইমামের পর আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, ভাষাবিদ, কেরাতবিদ, ইতিহাসবিদ মোটকথা সবাই তা মেনে নেয় এবং একে ঠিক মনে করে। তাহলে আমাদের তা মানতে অসুবিধা কোথায়?

এক্ষেত্রে সহজ-সরল যে প্রশ্নটি সবার আগে আসে তা হল, এতে যদি কোনো অসুবিধা থাকত তাহলে এত সব আলেম-উলামা তারা কোনো অসুবিধা কি ধরতে বা আঁচ করতে পারেননি? তাদের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানগরিমা, পাণ্ডিত্যের সামনে আমরা কিছুই না। তারা এত বিদ্বান হওয়ার পরও ভুলটি ধরতে পারেননি আর আমরা যারা তাদের সঙ্গে তুলনাও চলে না, আমরা এসে কীভাবে সে ভুলটি টের পেয়েছি?

মূলত এখানে কথা হল এই হাজার বছর যাবৎ চর্চিত রীতি, যা সমগ্র আলেম-উলামা মেনে নিয়েছেন, সামান্য কয়টি কিতাব ছাড়া ইসলামিক গ্রন্থের ভাণ্ডারে এমন কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না, যার লেখক এই নিয়ম মানেননি। এসব হাজার হাজার আলেম এক কথা বলেছেন। আর তাদের থেকে জ্ঞানগরিমায়, বুদ্ধি-প্রজ্ঞায়, শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যে অনেক স্তর নিচের বর্তমানকালের কিছু গবেষক ওই সব হাজার হাজার আলেমের বিপরীতে আরেক কথা বলছেন। তাহলে সরল নিয়মে কোন কথা গ্রহণযোগ্য?

জানা কথা, হাজার বছরের হাজার হাজার আলেম-উলামা যা বলেছেন তাই গ্রহণযোগ্য এবং তার বিপরীতটি বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যাজ্য।

নির্দিষ্ট এক মাযহাব অনুসরণ করা আবশ্যকীয়তার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম একটি কারণ এও বলেছেন যে, যদি যেকোনো মাসআলায় যেকোনো মাযহাব মতে আমল করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের এই নৈতিক অধঃপতনের যুগে যখন যে মাযহাবের মতামত তার প্রবৃত্তির সুবিধা মনে হবে, তখন সেটা পালন করবে। ফলে পুরো জীবন মাযহাব নাম দিয়েই ভোগ ও কুকামনা চরিতার্থ করতে থাকবে।

ইমাম নববী রহ. বলেন-

وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ جَازَ اتِّبَاعُ أَيِّ مَذْهَبٍ شَاءَ لَأَفْضٰى إِلٰى أَنْ يَلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ، وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ وَالْوُجُوْبِ وَالْجَوَازِ، وَذٰلِكَ يُؤَدِّيْ إِلَى انْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيْفِ.

অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট মাযহাব মানার আবশ্যকীয়তা হল এজন্য যে, যদি যেকোনো সময় যেকোনো মাযহাব অনুসরণের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ প্রত্যেক মাযহাবের সহজ ও প্রবৃত্তির সুবিধার জিনিসগুলো খুঁজতে থাকবে। একটি বিষয় এক মাযহাবে হারাম, অন্য মাযহাবে হালাল বা কোনো বিষয় এক মাযহাবে ওয়াজিব, আরেক মাযহাবে জায়েয, এ ক্ষেত্রে কোনটি গ্রহণ করবে, এর এখতেয়ার তার হাতেই থাকবে। (জানা কথা, তখন সে তার মর্জি ও সুবিধা মোতাবেক গ্রহণ করবে।) এতে তখন সে আর আল্লাহর বিধানের পাবন্দ থাকবে না। বরং তার মন ও সুবিধা তাড়িত হয়ে গেল। আলমাজমূ ১/৫৫

ইমাম শাতেবী রহ. ইমাম মাযেরী রহ. থেকে একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। ইমাম মাযেরী রহ.কে যখন মালেকী মাযহাবের একটি অপ্রসিদ্ধ মতের ওপর ফতোয়া দিতে বলা হয়, তখন তিনি এই কথা বলেন-

وَلَسْتُ مِمَّنْ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلٰى غَيْرِ الْمَعْرُوْفِ الْمَشْهُوْرِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، لِأَنَّ الْوَرَعَ قَلَّ، بَلْ كَادَ يَعْدَمُ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى الدِّيَانَاتِ كَذٰلِكَ، وَكَثُرَتِ الشَّهَوَاتُ وَكَثُرَ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْفَتْوٰى فِيْهِ، فَلَوْ فُتِحَ لَهُمْ بَابُ مُخَالَفَةِ الْمَذْهَبِ لَاتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ، وَهَتَكُوْا حِجَابَ هَيْبَةِ الْمَذْهَبِ، وَهٰذَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ الَّتِيْ لَا خَفَاءَ بِهَا.

‘মালেকী মাযহাবে যে মতটি অপ্রসিদ্ধ আমি মানুষের ওপর সেটি চাপিয়ে দেব না। কেননা, মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও খোদাভীতি

হ্রাস পেয়েছে, বরং প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। মনের চাহিদা-কামনা বেড়ে গেছে, ইলমহীনতা সত্ত্বেও ইলমের দাবিদার বেড়ে গেছে এবং ফতোয়ার ক্ষেত্রে দুঃসাহস দেখাচ্ছে, এরূপ মুহূর্তে যদি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীতে ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে ফেতনা-ফাসাদ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং মাযহাবের শ্রদ্ধা ও প্রভাব শেষ হয়ে যাবে আর এটা এমন এক ক্ষতি, যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।' আলমুওয়াফাকাত ৪/৪০০

একই ধরনের কথা আল্লামা ইবনে খালদূন রহ. শাতেবী রহ. শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. প্রমুখ বলে গেছেন। এর বিপরীত কথা কেউ বলে কি না জানি না। যদি বলেও থাকে, তাহলে মানুষ কার কথা মানবে? জানা কথা, ইমাম নববী রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. মাযেরী রহ. ইবনে খালদূন রহ. শাহ ওলীউল্লাহ রহ. প্রমুখের, নাকি তার?

কারা দলিল-প্রমাণ ও বিষয় সম্পর্কে বেশি প্রাজ্ঞ, তারা নাকি সে? তারপরও আমরা এখানে আরবের এক শায়েখের বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি মানুষকে সহীহ হাদীসের দিকে ডাকতেন, সে মোতাবেক আমল করতে বলতেন। তার বক্তব্য অন্য সকল বক্তব্য থেকে অধিক স্পষ্ট এবং শক্তিশালী। আশা করি, এরপর কারো কোনো সংশয় থাকবে না।

শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন রহ. সবসময় বলেন, জনসাধারণ তার অঞ্চলের আলেমগণের অনুসরণ করবে। অন্য দেশের আলেমদের নয়। এটাই হল তার মাযহাব। কেউ যদি বলে, আমার যখন যে আলেমের কাছে ফতোয়া জানতে মন চায় তার কাছে জিজ্ঞেস করবএতে অসুবিধা কীসের? এর জবাবে তিনি বলেন-

لَايَسُوْغُ لَكَ هٰذَا، لِأَنَّ فَرْضَكَ أَنْتَ هُوَ التَّقْلِيْدُ، وَأَحَقُّ مَنْ تُقَلِّدُ عُلَمَائُكَ وَلَوْ قَلَّدْتَّ مَنْ كَانَ خَارِجَ بَلَدِكَ أَدّٰى ذٰلِكَ إِلَى الْفَوْضٰى فِيْ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ ... فَالْعَامِّيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ عُلَمَاءَ بَلَدِهِ الَّذِيْنَ يَثِقُ

بهم.

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَعْدِيّ وَقَالَ: اَلْعَامَّةُ لَايُمْكِنُ أَنْ يُقَلِّدَ عُلَمَاءَ مِنْ خَارِجِ بَلَدِهِمْ، لِأَنَّ هٰذَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَوْضَى وَالنِّزَاعِ. وَلَوْ قَالَ: أَنَا لَا أَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ، لِأَنَّهُ يُوجَدُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مَنْ يَقُوْلُ: لَايَجِبُ الْوُضُوْءُ مِنْهُ، قُلْنَا: لَايُمْكِنُ، يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ، لِأَنَّ هٰذَا مَذْهَبُ عُلَمَائِكَ وَأَنْتَ مُقَلِّدُهُمْ.

অর্থাৎ তোমার জন্য এর কোনো বৈধতা ও সুযোগ নেই। কেননা, তোমার কর্তব্য হল তাকলীদ করা আর তোমার দেশের আলেমগণই হল তোমার জন্য তাকলীদের অধিক উপযোগী। তুমি যদি নিজের দেশের বাইরের আলেমদের তাকলীদ কর, তাহলে তা এমন দ্বন্দ্ব ও লাগামহীনতার দিকে নিয়ে যাবে, যা শরয়ী দলিল বহির্ভূত, যার কোনো দলিল নেই।

সুতরাং মুসলিম জনসাধারণের কর্তব্য হল, তাদের দেশের আলেমদের তাকলীদ করা। এই বিষয়টি আমাদের শায়েখ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দীও বলেছেন। তিনি বলেন, জনসাধারনের জন্য তার দেশের বাইরের আলেমদের তাকলীদ করার সুযোগই নেই। কেননা, তা বল্গাহীনতা ও ঝগড়া-বিবাদের দিকে নিয়ে যাবে।

যদি এই দেশের কেউ বলে, আমি উটের গোশত খেয়ে ওযু করব না। কেননা, কোনো কোনো দেশের আলেম ফতোয়া দেন উটের গোশত খেলে ওযু লাগে না। আমরা বলব, তোমার জন্য এই সুযোগ নেই। বরং তোমাকে ওযু করতেই হবে। কেননা, এটা তোমার দেশের আলেমদের মাযহাব। লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ (শামেলা)

আগের দীর্ঘ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হল, তাকলীদের সূচনা থেকেই তাকলীদে শাখছী চালু রয়েছে এবং এটাই কাল ও পরিবেশ হিসেবে বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। যেমনটি শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউছাইমীন ও তার শায়েখ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন।

এবার ওই ভাইদের আরেকটি প্রশ্নের উত্তরও এখান থেকে পাওয়া যায়। তারা প্রশ্ন করেন, মুসলিম কি কোনো একটি মাযহাব মানতে বাধ্য?

ভালোভাবে বোঝা দরকার, স্বতন্ত্রভাবে মুসলিম যেমন একটি মাযহাব মানতে বাধ্য নয়, তেমনিভাবে বিভিন্ন মাযহাবে তাকে ঘুরতে হবে—এমন বাধ্যও কেউ তাকে করেনি। তবে সে যদি পুরো জীবন এক মাযহাব মেনে চলে তাতে অসুবিধার কিছু নেই। নববী যুগ থেকে এই পর্যন্ত ফতোয়া-ফারায়েযের ধারা এভাবেই চলে এসেছে। এতে সমস্যার কিছু নেই। আর বহু মাযহাব অনুসরণ যেহেতু প্রবৃত্তির অনুসরণের পথ খুলে দেয় এবং নিজ অঞ্চলে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তাই এটা না করাই আবশ্যক। যেমনটি শায়েখ উছাইমীনসহ বহু আলেম বলেছেন। আর এতে কোনো ক্ষতিও নেই। কারণ, এক মাযহাব অনুসরণ করলেই চলে। তো এই নিয়ন্ত্রণ যৌক্তিক। এতে অসুবিধার কিছু নেই।

আচ্ছা, মুসলিম কোনো একটি মাযহাব মানতে বাধ্য নয়, কিন্তু যদি সে সারা জীবন শায়েখ আলবানীকে মানে, তাহলে তাদের কাছে কি এতে কোনো অসুবিধা আছে? আর তখন কি তার ক্ষেত্রেও একথা বলা হয় এবং তাকে বাধ্য করা হয় যে, তোমাকে অন্য শায়েখের কাছেও যেতে হবে?

কিন্তু চার ইমামকে মানতে গেলেই যতসব প্রশ্ন। হাদীস মানে না, তাকলীদ করছে, তাকলীদে শাখছীর মতো মহাপাপ হয়ে যাচ্ছে। আর শায়েখ আলবানীকে তার বিচ্ছিন্ন মতবাদসহ ইমাম মানলে তখন মাযহাব মানা হয় না, হাদীস মানা হয়; তাকলীদে শাখছী হয় না, কুরআন হাদীসের অনুসরণ হয়।

আচ্ছা, তাকলীদে শাখছী মন্দ জিনিস, তাহলে সারাজীবন ওই ভাইয়েরা শায়েখ আলবানী ও তার মতাদর্শের শায়েখদের কেন জিজ্ঞেস করে? এক মাসআলায় শায়েখ আলবানী রহ.কে জিজ্ঞেস করবে। আরেক মাসআলায় দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীকে

করবে। আরেক মাসআলায় দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীকে জিজ্ঞেস করবে। আরেক মাসআলায় মরক্কোর কোনো মুফতীকে জিজ্ঞেস করবে। এভাবে পুরো জীবন পার করবে অথবা প্রতিটি মাসআলাতেই বিভিন্ন মুফতীকে জিজ্ঞেস করবে। এরপর যে ফতোয়া সুবিধা মনে হয় সেটা গ্রহণ করবে। কিন্তু আমরা তো তাদের কাউকে এমন করতে দেখি না, বরং তারা নিজেদের শায়েখ ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞেস তো দূরের কথা, খুব সম্ভব জিজ্ঞেস করার যোগ্যও মনে করে না। তারা তাদের শায়েখকে এমন মানা মানে যে, তার ফতোয়া যদি সমগ্র সাহাবীর ফতোয়া, সালাফের ফতোয়া ও ঐকমত্যেরও বিপরীত হয়, তাহলেও তা গোগ্রাসে গিলে নেয়। তাদের গোঁড়া তাকলীদে শাখছীর এর চেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ আর কী আছে?!!

স্পষ্ট কথা হল, মাযহাব তারাও মানে অন্যরাও মানে, তাকলীদ তারাও করে অন্যরাও করে। তারা যা করে তা তাকলীদে শাখছী, অন্যরা যা করে তাও তাকলীদে শাখছী। কিন্তু বুঝে অথবা না-বুঝে মিথ্যাচার করা হয় তারা হাদীস মানে অন্যরা মানে মাযহাব, তারা হাদীসের অনুসারী অন্যরা হল তাকলীদকারী।

আসল কথা হল, আজ পৃথিবীর সকল মুসলমান যদি নবী ও সাহাবী যুগ থেকে চলে আসা সব ফতোয়া বাদ দিয়ে শায়েখ আলবানীর মাযহাব মেনে নেয় এবং তার গোঁড়া তাকলীদ করে, তাহলেই সব প্রশ্ন শেষ। সবাই তখন মাযহাব মেনেও হাদীসের অনুসারী হয়ে যাবে, কঠিন তাকলীদে শাখছী করেও আহলে হাদীস হয়ে যাবে। বিজ্ঞজন সুন্দর বলেছেন-

‘তোমরা মূলত মানুষকে হাদীসের দিকে ডাকছ না, বরং নিজেদের মতের অনুসরণে বাধ্য করছ।’

আরো স্পষ্ট কথা হল, তারা তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী যুগের দ্বীন, ঈমান, ইলম, প্রজ্ঞা, জ্ঞান-গভীরতা ও তাকওয়া-পরহেযগারিতে শ্রেষ্ঠ ইমামদের তাকলীদে শাখছী ত্যাগ করে তাঁদের চেয়ে অনেক নিচের নিজেদের শায়েখদের তাকলীদে শাখছী করতে বাধ্য করছে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা খুব জরুরি তাকলীদে শাখছী করতে গেলে যে কথাটি সামনে আসে তা হল, একজন মুফতীর তো ভুল হতেই পারে; তাই তার সব কথা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

কথা ঠিক। তবে চার মাযহাব যেহেতু হাজার বছরেরও অধিক চর্চিত হয়ে আসছে এবং সেগুলোর দলিল-প্রমাণ নিয়ে খুঁটিনাটি চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়ে আসছে, তাই প্রত্যেক মাযহাবের উলামায়ে কেরাম নিজনিজ মাযহাবের যেসব মাসআলায় ইমামের ভুল হয়েছে তা বাদ দিয়ে সঠিক ফতোয়াটি প্রতিস্থাপন করেছেন এবং সেটি মাযহাবে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। প্রতিটি মাযহাবেই এ ধরনের কিছু মাসআলা আছে, যেখানে ইমামের ফতোয়া দুর্বল হওয়ার কারণে তা বাদ দিয়ে সঠিক মত গ্রহণ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যে মাযহাব বা গবেষণার জন্ম সাম্প্রতিককালে। আর এই গবেষকও যেহেতু মানুষ, তাই তারও ভুল হতে পারে। বরং এরা যেহেতু সালাফের ইমামদের চেয়ে ইলম, আমল, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতায় অনেক নিচে, তাই তাদের প্রচুর ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এদের অনুসারীরা এসব ভুল চিহ্নিত করেনি, যা চার মাযহাবের ক্ষেত্রে হয়েছে। এবার ভাবা দরকার, আমি কোন মুফতী বা মাযহাবের অনুসরণ করব, যার ভুলগুলো চিহ্নিত হয়ে সঠিক মতটি তাতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, না যার ভুল অনেক এবং সেগুলোর স্থানে সঠিকগুলো প্রতিস্থাপিত হয়নি? আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফীকদাতা।

আরো ভাবা দরকার, আমি কি খাইরুল কুরূন বা এর কাছাকাছি সময়ের ইমাম ও ফকীহের মাযহাব অনুসরণ করব, নাকি খাইরুল কুরূনের হাজার বছর পরের এমন কোনো আলেমের অনুসরণ করব, যার ইলমী সনদটুকু পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ?

কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, আচ্ছা, কবরে কি মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি মাযহাব মেনেছ কি না, মানলে কোন মাযহাব মেনেছ? কুরআন হাদীসের কোথাও নেই, কবরে এ ধরনের প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং মাযহাব বাতিল।

স্থূলদৃষ্টিতে কথাটি কোনো কোনো দুর্বল ব্যক্তির মন কাড়তে পারে। কারণ, এটা মুখরোচক। কিন্তু এও একটি অজ্ঞতাপ্রসূত প্রশ্ন। শরীয়তের প্রতি অজ্ঞতার এই যুগে এ ধরনের স্পষ্ট ভুল কথাও লুফে নেওয়া হচ্ছে।

কুরআন হাদীসে কবরের প্রশ্ন-সংক্রান্ত যত বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে শুধু এতটুকু পাওয়া যায়, কবরে সর্বমোট তিনটি প্রশ্ন করা হবে তোমার রব কে, তোমার দ্বীন কী, তোমাদের কাছে প্রেরিত ব্যক্তিটি কে?

এর বাইরে অন্য কোনো প্রশ্ন করা হবে বলে কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। যারা উপরিউক্ত প্রশ্নটি করে, মনে হয় তাদের ধারণা যে, কবরে যা জিজ্ঞেস করা হবে, তাই সত্য সঠিক ও জরুরি। আর যা জিজ্ঞেস করা হবে না, তা অসত্য, অশুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য।

আচ্ছা, কুরআন হাদীসের কোথাও কি আছে, কবরে তাকে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকভাবে পড়েছে কি না, রোযা ঠিকভাবে আদায় করছে কি না। তেমনিভাবে হজ যাকাতসহ সকল ইবাদত। অনুরূপ তাকে তার কামাই রোজগার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে কি না, তা হালাল ছিল না হারাম, বান্দার হক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে কি না। এভাবে তার পুরো জীবনের অন্যান্য আমল ও কাজ।

জানা কথা, কুরআন হাদীসের কোথাও নেই যে, কবরে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। হ্যাঁ, তবে কবরের হাজার হাজার বছর পর কেয়ামতে জিজ্ঞেস করা হবে। তাহলে এই ব্যক্তির ধারণা অনুসারে

কোনো আযাব নেই। উদ্দেশ্য শুধু প্রশ্ন সম্পর্কে। অর্থাৎ কবরে কী কী প্রশ্ন করা হবে। বাকি, কবরেও তার সারা জীবনের পুরো আমলের আলোকেই শান্তি বা শাস্তি হবে।

আচ্ছা, কবরে মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করলেও কেউ যদি নির্দিষ্ট কোনো মুফতীর ফতোয়া বা মাযহাব মানে, তাকে কি কবরে তিরস্কার করা হবে যে, তুমি ইমাম মালেককে মানলে কেন? তুমি শাফেয়ী কেন? তুমি হানাফী কেন? তুমি হাম্বলী কেন? আর পুরো জীবন এক মাযহাব মানলে কেন? সব মাযহাব মানলে না কেন?

আচ্ছা, যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তিরস্কার করা হবে, তাহলে যে সব সময় শায়েখ আলবানীকে মানে, তাকে কি তিরস্কার করা হবে যে, তুমি সব সময় একজনকে মানলে কেন? যদি না হয়, তাহলে তার কারণ কী?

ইমাম মালেক রহ. ইমাম আহমাদ রহ.-এর মতো আলেমকে সারাজীবন মানলে তিরস্কার করা হবে আর শায়েখ আলবানীকে মানলে তিরস্কার করা হবে না, এর কারণ কী?

আসল কথা হল, কবরে যদি তার পুরো জীবনের সবকিছু নিয়ে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে সে যদি তার জীবনে কোনো মুফতীকে না মেনে নিজেই গবেষণা করে, অথচ সে তার যোগ্য নয়, তাহলে তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। কেননা, এটা অপরাধ।

আর যদি সে কোনো প্রাজ্ঞ মুফতীর অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করে, তাহলে তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। কেননা, এটিই তার কর্তব্য। এছাড়া তার কোনো উপায় নেই। এবার আমরা বুঝি, কী ধরনের উদ্ভট ও ভ্রান্ত কথা দিয়ে সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে আর আমরাও কী ধরনের কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ি। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়েত দান করুন, আমীন।

এ সম্পর্কেও বেশ বিতর্ক শোনা যায়, মুকাল্লিদ দলিল জানবে কি না?

কেউ কেউ বলেন, তার দলিল জানা আবশ্যক। মুকাল্লিদ মুফতীর কাছে কোনো ফতোয়া জানতে চাইলে, ফতোয়ার সঙ্গে দলিলও তাকে মুফতীর জানাতে হবে। মুফতী থেকে সে এমনভাবে দলিল চেয়ে নেবে, যেমন শ্রমিক মালিক থেকে পারিশ্রমিক চেয়ে নেয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, মুকাল্লিদের দলিল চাওয়ার কোনো অধিকারই নেই। কেননা সে মুকাল্লিদ, দলিল চাইলে সে আর মুকাল্লিদ থাকে না। তাই সঙ্গত মনে হচ্ছে, এ প্রসঙ্গেও কিছু আলোচনা হোক। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফীকদাতা।

ইসলাম ধর্ম যেমন আকায়েদ ও বিধানের নাম, তেমনি এসবের দলিল ও প্রমাণেরও নাম। অর্থাৎ আকীদা-বিধান এবং এসবের দলিল-প্রমাণ সবকিছু মিলেই ইসলাম। ইসলামের প্রধান আকীদা তাওহীদ। আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা-রিযিকদাতা, তিনি সকল কিছুর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণকর্তা; তিনি ছাড়া 'শরিকেরা' এসবের কিছুই করতে পারে নাএ বিষয়টি কুরআন হাদীসে কত যে দলিল-প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে, তার হিসাব করা মুশকিল।

তেমনিভাবে রিসালাত, আখেরাত প্রভৃতি আকীদাও। জানা কথা, আল্লাহ তাআলা এসব দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন বোঝানোর জন্য, হেদায়েতের পথে আসার জন্য। যারা সঠিক পথে আছে, তাদের ঈমান আরো মজবুত হওয়ার জন্য। অনুরূপ প্রতিটি হুকুম-আহকাম ও বিধানের যৌক্তিকতা ও দলিল তুলে ধরা হয়েছে।

এগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন জানার জন্য, বোঝার জন্য। তো আকীদা ও তার দলিল, মাসআলা বা আহকাম ও তার দলিল পুরোটা মিলেই ইসলাম। শুধু আকীদা ও মাসআলাসমূহ জানলেই আমল করা যায়। যদি সেগুলোর দলিলও জানা থাকে এবং ভালোভাবে বুঝে, তাহলে পুরো দ্বীনের রুচি-প্রকৃতি বোঝা যায়, ফাকাহাত ও সমঝ তৈরি হয়। নিজের ঈমান বৃদ্ধি পায়। অন্য ধর্মের লোকদের দাওয়াত দেওয়া সহজ হয়। তাদের পক্ষ থেকে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। দ্বীনের সত্যতা প্রকাশ পায়। নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান বের করা যায় ইত্যাদি। যারা দ্বীনের এই উভয় দিক জানে এবং বুঝে, তাদেরকে বলা হয় আসল আলেম, হামিলে ইলমে দ্বীন, 'ফকীহ ফিদ্দীন'।

একজন মুসলমানের জন্য উত্তম থেকে উত্তম হল, সে ইসলামে প্রবেশের পর ইসলামের আকীদা ও বিধিবিধান যেমন জানবে, তেমনিভাবে সেগুলোর দলিল-প্রমাণও জানবে, ভালোভাবে বুঝবে এবং সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এ কারণেই কুরআন হাদীসে ফকীহ আলেমদের বহু সম্মান উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি, এ পর্যায়ে পৌঁছার জন্য অনেক মেধা, যোগ্যতা ও খোদা প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার দরকার। যা সব মানুষকে আল্লাহ তাআলা দেননি। কাউকে দিয়েছেন, কাউকে দেননি। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে তার আকীদা-বিশ্বাস ও মাসআলার ক্ষেত্রে দলিল জানতেও বাধ্য করেননি। আর এটা শুধু ইসলামী শাস্ত্রসমূহের একক নীতি নয়, বরং জাগতিক শাস্ত্রসমূহেরও একই নীতি।

একজন অসুস্থ ব্যক্তি যখন চিকিৎসকের কাছে যায়, চিকিৎসক তার যাবতীয় অবস্থা শুনে ওষুধ দেন। কিন্তু রোগীকে বলেন না, কোন ওষুধটি কেন দিয়েছেন, কোন প্রমাণে বা কোন সূত্রে তা দিয়েছেন। রোগীও নির্দ্বিধায় কোনো সংশয় ছাড়াই চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী ওষুধ সেবন করছে এবং সুস্থ হচ্ছে। কিন্তু তার কল্পনায়ও আসে না, আমি তো এর দলিল-প্রমাণ জানলাম না। কারণ, সে বুঝে এসব কোনো

কিছুই সে বুঝবে না। তাই সে এসব জানতে চায় না। চিকিৎসকও তাকে এসব বলে না।

হ্যাঁ, রোগী যদি চিকিৎসক হয় বা চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে তার জানাশোনা থাকে, তাহলে রোগী চিকিৎসক থেকে চিকিৎসার যুক্তি ও সূত্র বুঝে নিতে পারে এবং চিকিৎসকও তাকে বোঝাতে পারে। সুতরাং সব শাস্ত্রের সব বিবেকবানেরই নীতি শাস্ত্র সম্পর্কে যারা সাধারণ, তাদেরকে শাস্ত্রের এ সবকিছু বোঝান না। কারণ, তা নিষ্ফল।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। মুকাল্লিদ যদি দলিল-প্রমাণ বোঝার যোগ্যতা রাখে, তাহলে সে দলিল-প্রমাণ বুঝতে পারবে। তা ছাড়া দলিল-প্রমাণ বুঝে আরো পাকাপোক্ত হওয়াই কাম্য। আর যদি সে এসব বোঝার যোগ্যতা না রাখে, তাহলে দলিল-প্রমাণ জিজ্ঞেস করেও তার কোনো ফায়েদা নেই।

সুতরাং কেউ যদি বলে, মুকাল্লিদের দলিল-প্রমাণ জানার অধিকার নেই, জানতে চাইলে সে মুকাল্লিদ থেকে বেরিয়ে যাবে, তাহলে তার কথা ভুল। কেননা, আমরা প্রত্যেক মাযহাবে হাজার হাজার আলেম দেখতে পাই, যারা মাযহাবের তাকলীদ করতেন এবং দলিল-প্রমাণও জানতেন। আবার কেউ যদি বলে, মুকাল্লিদকে দলিল-প্রমাণসহ জানতে হবে। তার দলিল জানা ওয়াজিব। তাহলে তার কথাও ভুল। এ ধরনের ব্যক্তির ওপর দলিল-প্রমাণ বোঝার বাধ্যবাধকতা করে দেওয়া নিষ্ফল ও বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, সে এসব বুঝবেই না।

উদাহরণস্বরূপ, এ ধরনের একজন কোনো মুজতাহিদ ফকীহের কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে বললেন, আপনার প্রশ্নের সমাধান এই। এই হাদীসে হুবহু এভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু কথা থেকে যায়, হাদীস সহীহ কি না।

তাই সে সরল প্রশ্ন করল, হাদীস কি সহীহ? ফকীহের উত্তর, হ্যাঁ সহীহ। যেহেতু দলিল-প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা গ্রহণ করা নিষেধ। এবার তার আবাব প্রশ্ন, সহীহ হল কীভাবে? একটি হাদীস সহীহ হতে হলে কী কী শর্ত, সেগুলো পাওয়া গিয়েছে কি না, প্রতিটি রাবী বা বর্ণনাকারী 'ছিকা' কি না, হাদীসের বক্তব্যটি শুযুয ও নাকারাহ থেকে মুক্ত কি না এবং এসব কীভাবে? এ সবকিছু দলিল-প্রমাণসহ দেখিয়ে দিন। অথচ লোকটি হাদীস ও র্জাহ-তাদীলের কিতাব তো দূরের কথা কুরআন মাজীদও পড়তে পারে না। তাহলে ফকীহ সাহেব কীভাবে তাকে এসব বোঝাবেন। কেউ যদি বোকামি করেনও অর্থাৎ তাকে বোঝান, তাহলে সে কি এসব বুঝবে? যদি সে বলে না, আমি বুঝেছি, তাহলে তার এই দাবি এবং তার বোঝের কোনো গ্রহণযোগ্যতা হবে?

এ তো গেল, যদি মাসআলাটি সরাসরি হাদীসে থাকে এবং সে মাসআলায় বিপরীতমুখী কোনো সহীহ হাদীস না থাকে। কিন্তু যদি একই মাসআলায় বিপরীতমুখী একাধিক হাদীস থাকে, আর মুজতাহিদ যে কোনো একটি হাদীস প্রাধান্য দিয়ে সে মোতাবেক ফতোয়া দেন, তাহলে ওই ব্যক্তিকে সব হাদীস দেখাতে হবে, সব হাদীস সহীহ কি না, তাও আগের মতো দলিল-প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হবে এবং অন্যান্য হাদীস বাদ দিয়ে তিনি কেন এই হাদীস গ্রহণ করেছেনএ সবকিছুই দলিল-প্রমাণসহ ওই লোককে বোঝাতে হবে।

আবার কখনো এমন হয়, ফকীহ যে হাদীসকে সহীহ বলেছেন, সেটি সম্পর্কে আরেক হাদীস বিশারদের আপত্তি আছে অথবা ফকীহ যে হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন সেটিকে আগের কোনো হাদীসের ইমাম সহীহ বলেছেন। এই ক্ষেত্রে আরেক হাদীস বিশারদের আপত্তির খ-ন কী? আগের যে ইমাম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন তার উত্তর কী? ফকীহ যে কারণে যয়ীফ বললেন তার বাস্তবতা ও প্রামাণ্যতা কী? এ সবকিছু ওই লোককে দলিল-প্রমাণসহ বোঝাতে হবে।

এ তো গেল, যদি মাসআলাটি সরাসরি হাদীসে উল্লেখ থাকে, কিন্তু যদি মাসআলাটি সরাসরি উল্লেখ না থাকে, যেমনটি নিত্যনতুন সকল মাসআলার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে ফকীহ কুরআন হাদীসের মূলনীতির আলোকে উত্তর দিয়ে থাকেন অথবা إِشَارَةُ النَّصِّ বা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বা একটি মাসআলাকে সমগোত্রীয় অন্য মাসআলার সঙ্গে মিলিয়ে অথবা বিধান উদ্ঘাটনের সঠিক যত পদ্ধতি আছে, সেগুলোর আলোকে সমাধান দেন। তাহলে ওই লোককে দলিল-প্রমাণসহ জানাতে হলে এ সবকিছু খুলে খুলে বোঝাতে হবে। যদি এ মাসআলায় অন্য কোনো মুফতীর দলিল না থাকে, তাহলে তো রক্ষা হল। আর যদি এ ক্ষেত্রে দ্বিমত-ত্রিমত বা চতুর্মত থাকে, তাহলে অন্য সব মতের খ-ন ও দলিল প্রমাণসহ জানাতে হবে। জানা কথা, তখন তাকে ইস্তেম্বাত ও তাহকীকের বিশাল সাগরে ডুবিয়ে দিতে হবে অথচ তার যোগ্যতা হল, সে সূরা ফাতেহাও সহীহভাবে পড়তে পারে না। পৃথিবীর কোনো বিবেকবান কি এ ধরনের ব্যক্তিকে এ সবকিছু বোঝাতে পারবে? বা বলবে, সে এসব বুঝতে বাধ্য?

কেউ যদি বোকামি করে তাকে বোঝায় এবং সেও বলে, আমি বুঝেছি, তাহলে তার কথাটি হবে এমন, যেমন কোনো অবুঝ শিশুকে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধপূর্ণ সূত্র বোঝানো হল, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল তুমি কি বুঝেছ? আর উত্তরে সে সহাস্যে বলল হ্যাঁ, আমি সব বুঝেছি।

আল্লামা খতীব বাগদাদী রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ'তে এ ধরনের একটি অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। তাতে তিনি চমৎকার বলেছেন-

وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوْزُ لِلْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْعَالِمِ حَتّٰى يَعْرِفَ عِلَّةَ الْحُكْمِ، وَإِذَا سَأَلَ الْعَالِمَ فَإِنَّمَا يَسْأَلُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ طَرِيْقَ الْحُكْمِ، فَإِذَا عَرَّفَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ وَعَمِلَ بِهِ وَهٰذَا غَلَطٌ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيْلَ لِلْعَامِّيِّ إِلَى الْوُقُوْفِ عَلٰى ذٰلِكَ، إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَفَقَّهَ سِنِيْنَ كَثِيْرَةً، وَيُخَالِطَ الْفُقَهَاءَ

المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس، ويعلم ما يصححه ويفسده وما يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَفِي تَكْلِيفِ الْعَامَّةِ بِذٰلِكَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطِيقُونَهُ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ.

‘কতক মুতাযিলা থেকে বর্ণিত। তারা বলে, সাধারণ মানুষের জন্য কোনো আলেম মুফতীর ফতোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত মানা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সেটির দলিল-প্রমাণ জানবে। যখন কোনো আলেমকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব কোন ভিত্তিতে কোন পদ্ধতিতে দিয়েছে, তাও জিজ্ঞেস করবে। এরপর আলেম তা বললে প্রশ্নকারী যদি তা ভালোভাবে বুঝে, তাহলে তার ওপর আমল করবে।

এটি একটি ভ্রান্ত মত। কেননা, সাধারণ মানুষ এসব বুঝতে হলে তাকে বহু বছর সুস্থ সজ্ঞানে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গভীরভাবে পড়াশোনা করতে হবে। অনেক দীর্ঘ সময় ফকীহদের সাহচর্যে থাকতে হবে। কতভাবে কুরআন হাদীস থেকে বিধান আহরণ করা যায়, তা সব জানতে হবে এবং এসবের কোন পদ্ধতি ঠিক ও কোন পদ্ধতি ভুল এবং কোন দলিল প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তা জানতে হবে। সাধারণ মানুষকে এ সবকিছুতে বাধ্য করার মানে হল, যা তাদের সামর্থ্যে নেই তাতে বাধ্য করা। কারণ, এসব করার তাদের কোনো পথ ও সুযোগ নেই।’ আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/১৩৪-১৩৫

খতীব বাগদাদী রহ.-এর বক্তব্য স্পষ্ট, তাতে কোনো ব্যাখ্যা বা টীকা সংযোজনের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি ফতোয়ার দলিল-প্রমাণ বুঝে এবং সে মাসআলায় অন্যদের দলিল খ-ন করে নিজে একটি মত প্রতিষ্ঠিত করতে কত পড়াশোনা এবং কত কিছুর দরকার তা খতীবের কথায় স্পষ্ট। আজ আমাদের ভাইয়েরা চটি কয়েকটা অনুবাদ পড়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর যুগের মহা বিদ্বানদের ওপর ছড়ি ঘোরান। যখন তখন যে কারো ভুল ধরেন, সেই অন্ধের হাতে কাঁচি

দেওয়ার মতো, যে কাটছে কিন্তু কী কাটছে কোনটি কাটছে কিছুই জানে না।

খতীব বাগদাদী রহ.-এর বক্তব্য থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট, প্রত্যেক মাসআলায় দলিল-প্রমাণ জানতে বাধ্য করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর মত নয়। বরং তা ভ্রান্ত ফেরকা মুতাযিলাদের মত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর মতে এ মতটি ভ্রান্ত। তাই খতীব বাগদাদী রহ. এর খ-নে স্বতন্ত্র অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন। তাই যারা বর্তমানে প্রত্যেক ফতোয়ায় দলিল-প্রমাণ জানার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন, তাদের ভাবা দরকার, তারা কার মতবাদ ব্যক্ত করছেন এবং কাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন, আমীন।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য দলিল-প্রমাণ জানার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা নয়, বরং যারা দলিল-প্রমাণ বোঝার যোগ্য তারা দলিল-প্রমাণসহই ফতোয়া ও মাসআলা জানবে। এটা শরীয়তেও কাম্য। কিন্তু যাদের দলিল বোঝার যোগ্যতা নেই কিংবা আরবীই পড়তে পারে না, তাদের ওপর দলিল জানার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যেমন অনাচার, তেমনি বিবেক বিবর্জিতও। ব্যস, এটুকু শুধু পরিষ্কার করা দরকার। আশা করি তা হয়েছে।

এখন যারা প্রতিটি মাসআলায় মুকাল্লিদের জন্য দলিল-প্রমাণ জানা আবশ্যক বলেন, তাদের কাছে দুইটি অনুরোধ বা দাবি

এক. কোনো শায়েখের একমুখী বক্তব্যকে তারা যেন দলিল মনে না করে ফেলেন। তাদের, বরং বলতে গেলে সবারই এই ভুলটি হয় যে, একটি মাসআলায় কোনো শায়েখের বক্তব্য পেয়ে গেল; ব্যস, মনে করে নিল, তারা দলিল পেয়ে গেছে, দলিলসহ মাসআলা জেনে গেছে। অথচ সেটি ওই শায়েখের নিরেট দাবি, দলিল নয়।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো শায়েখ তার বক্তব্যে বা কোনো চটি বইয়ে লিখে দিলেন ‘মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। কেননা হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না। আর মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা না-পড়া-সংক্রান্ত যত হাদীস আছে সব যয়ীফ।’

এই ভাইদের কেউ যখন সে বক্তব্যটা পান, তখন তিনি মনে করে বসেন, তিনি মাসআলাটি দলিলসহ জেনে ফেলেছেন। তিনি আনন্দে আন্দোলিত হতে থাকেন। আর যারা সূরা ফাতেহা পড়ে না তাদের প্রতি ফুঁসে ওঠেন, কী জঘন্য অপরাধই না তারা করে চলেছে! পুরো জীবনই তাদের মাটি হয়ে যাচ্ছে! অথচ শায়েখ এখানে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা তার নিরেট দাবিমাত্র। আর এ ভাই তার অন্ধ অনুসারী বা তাকলীদকারী। এটা দলিল নয়, এর নাম দলিল জানা নয়।

তেমনিভাবে কোনো শায়েখ লিখে দিলেন ‘নামাযে আমীন জোরে বলবে। কেননা তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর আমীন আস্তে বলার যেসব হাদীস আছে তার সবই যয়ীফ।’

এই ভাইয়েরা এ বক্তব্য দেখে পুলকিত হয়ে গেলেন যে, দলিলসহ মাসআলাটি জেনে গেছেন। তাই অন্যদেরকে তিরস্কার করা শুরু করেন। অথচ এটাও ওই শায়েখের নিছক দাবিমাত্র। আর এসব ভাই তার অনুসারী। এটা দলিল নয়। এর নাম দলিলসহ মাসআলা জানা নয়। দলিলসহ মাসআলা যদি জানতে হয়, তাহলে সূরা ফাতেহা-সংক্রান্ত যত হাদীস আছে সব বের করতে হবে, তারপর প্রতিটির সনদ বের করে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর অবস্থা যাচাই করতে হবে। এরপর হাদীসের মান নির্ণয় করতে হবে, কেউ কোনো হাদীসকে যয়ীফ বললে কেন বলল তার বিপরীত কিছু আছে কি না, সহীহ বললে কোন প্রমাণে, এর বিপরীতে কিছু আছে কি না, থাকলে সঠিক কোনটি। কিতাবাদি দেখে দলিলসহ সঠিক সমাধান জানতে হবে। এরপর একাধিক হাদীস থাকলে কোনটিকে প্রাধান্য দেব, কেন দেব, অন্য কেউ আরেকটিকে প্রাধান্য দিয়েছে কি না, কেন

কেন দেব, অন্য কেউ আরেকটিকে প্রাধান্য দিয়েছে কি না, কেন দিল, তার জবাব কী—এ সবকিছুও দলিলসহ জানতে হবে। এরপর সাহাবী-তাবেয়ীদের ফতোয়া কী ছিল তা বের করতে হবে। এরপর শায়েখ তার বক্তব্যে যতগুলো দাবি বা কথা বলেছেন, সেগুলোর মূল সূত্রও গ্রন্থ থেকে বের করে সত্যাসত্য যাচাই করে দেখার পরই বলা যাবে যে, দলিলসহ মাসআলা জেনেছে।

তেমনি আমীন বলার ক্ষেত্রে। প্রথমে এ-সংক্রান্ত সব হাদীস বের কর এবং শাস্ত্রীয় নিয়মে সেগুলো যাচাই কর। শায়েখ যে বলল আমীন জোরে বলা—এটাই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটা ঠিক কি না, নিজে যাচাই করতে হবে। এরপর তিনি যে বললেন, আস্তে বলার সব হাদীস যয়ীফ। এখানে সবকটি হাদীস বের করে এবং সেগুলোর সনদ বের করে রাবীদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। কেউ কি এসব হাদীসকে বা কোনো এক হাদীসকে সহীহ বলেছেন কি না, বললে তার দলিল কী এবং তার জবাব কী ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকিছু দলিলসহ বুঝলেই তবে বলা যাবে দলিলসহ জেনেছে। আর যদি এসব কিছু না দেখে, শুধু শায়েখের বক্তব্য শুনে তা বিশ্বাস করে ফেলে এবং মানুষকে বলতে থাকে যে, মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়বে, আমীন জোরে বলবে। দলিল হল শায়েখের বক্তব্য বা কোনো লেখা বা শায়েখের উদ্ধৃত কোনো হাদীস। এটা কিন্তু বন্ধু, দলিল জানার নামমাত্রও হল না। বরং শায়েখ যা লিখেছেন, যা দাবি করেছেন তার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসই হল।

দুই. দলিল যদি জানতে হয়, তবে যত ধরনের মাসআলা আছে রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, বিচারকার্য, বিয়েশাদি, দ-বিধি ইত্যাদি সকল মাসআলায় দলিল জানতে হবে। শুধু নামাযের ছয়-সাতটি মাসআলায় নয়।

কোনো কোনো ভাই এমন কথাও বলে থাকেন, ইমামগণ তো তাঁদের ফতোয়া মানতে বলেননি। তাঁদের তাকলীদ করতে বলেননি। তাই আমরা তাঁদের তাকলীদ করব কেন?

এ ধরনের কথা শুনে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কারণ, কারো তাকলীদ করা না-করাটা শরয়ী হুকুম। এর ফয়সালা তো শরয়ী হুকুম মোতাবেক হবে। শরয়ী হুকুম মোতাবেক যার তাকলীদ করা হবে তিনি তাকলীদ করতে বললেও তার তাকলীদ করা যাবে এবং নিষেধ করলেও করা যাবে। আসল কথা হল ফতোয়া খুবই নাজুক ও ভয়ের বিষয়। একজন মুফতীর ফতোয়াদান মানে হল সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কী বিধান তা কেমন যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনে নিয়ে জিজ্ঞেসকারীকে জানানো। ফতোয়ায় দস্তখত করার মানে হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধান বুঝে নিয়ে আল্লাহর পক্ষ হয়ে দস্তখত করা যে, এটাই আল্লাহ তাআলার বিধান। তো কোনো বিষয়ে আল্লাহর নায়েব ও প্রতিনিধি হয়ে দস্তখত করা, তা কত স্পর্শকাতর ও ভয়ের বিষয়, তা সাধারণ একজন মুমিনের কাছে সুস্পষ্ট। ইবনুল মুনকাদির রহ. বলেন--

اَلْعَالِمُ بَيْنَ اللهِ وَخَلْقِهِ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ.

'মুফতী আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে মাধ্যম। এবার মুফতী নিজে ভেবে দেখুক, সে কীভাবে মধ্যস্থতা করবে!' হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/১৫৩

ইবনুল কায়্যিম রহ. লেখেন-

وَلْيَعْلَمِ الْمُفْتِي عَمَّنْ يَنُوبُ فِي فَتْوَاهُ، وَلْيُوقِنْ أَنَّهُ مَسْؤُولٌ غَدًا وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالٰى.

'মুফতী ভেবে নিক, সে তার ফতোয়ায় কার মধ্যস্থতা করছে এবং কার পক্ষ থেকে ফতোয়া দিচ্ছে। সে যেন বিশ্বাস রাখে, আগামীকাল তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তাকে আল্লাহর সামনে দ-া য়মান হতে হবে।' ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন ১/১১

ইমাম মালেক রহ.-এর এক শাগরেদ বলেন-

وَاللهِ إِنْ كَانَ مَالِكٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَأَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

'আল্লাহর শপথ, ইমাম মালেককে যখন কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় তখন উত্তর দেওয়ার সময় মনে হত তিনি যেন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দ-ায়মান।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩৫৪

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন-

لَوْلَا الْفَرَقُ مِنَ اللهِ أَنْ يَضِيعَ الْعِلْمُ مَا أَفْتَيْتُ أَحَدًا، يَكُوْنُ لَهُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْوِزْرُ.

'ইলম বিলুপ্তির কারণে যদি আল্লাহ তাআলার পাকড়াওয়ের ভয় না থাকত, তাহলে আমি একজন ব্যক্তিকেও ফতোয়া দিতাম না; লাভ সব তার আর বোঝা সব আমার! অর্থাৎ উপকার ভোগ তো করবে সে আর এর দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩৫৬

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, ইমাম মালেক রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ সমকালীন মদীনার বরেণ্য মুফতী ইমাম রবীআ রহ.-কে তাঁর এক উস্তাদ বলেন আমি দেখছি তোমার কাছে বহু মানুষ মাসআলা জানতে আসে। তো তাদেরকে ফতোয়া দেওয়ার সময় তোমার পুরো চিন্তা যেন এমন না হয় যে, তাদেরকে তুমি কীভাবে বাঁচাবে, বরং তোমার চিন্তা যেন এই হয় যে, তুমি কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে।

তো ফতোয়া যে অত্যন্ত ভয়ের ও অতি নাজুক বিষয় তা সকল মুফতীর কাছেই স্পষ্ট। বিশেষত সালাফের মুফতীগণ তো এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভীত ছিলেন। এজন্যই তাঁদের অনেকে মাসআলা জানা থাকা সত্ত্বেও ফতোয়া দিতে চাইতেন না।

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা রহ. বলেন-

أَدْرَكْتُ عِشْرِيْنَ وَمِئَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيَرُدُّهَا هٰذَا إِلٰى هٰذَا، وَهٰذَا إِلٰى هٰذَا، حَتّٰى تَرْجِعَ إِلَى الأَوَّلِ.

'আমি একশ বিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, তাদের কাউকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, তিনি আরেকজনের কাছে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় প্রথমজনের কাছে আসত।' সুনানে দারেমী ১/২৪৮ (১৩৭)

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন-

وَلَايُسْتَفْتَى عَنْ شَيْءٍ إِلّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا.

'তাঁদের কাউকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তাঁর কামনা থাকত, যদি অন্য কেউ জবাবটি দিয়ে দিত।' প্রাগুক্ত

হযরত বারা ইবনে আযিব রা. বলেন, 'আমি তিনশ বদরী সাহাবীকে দেখেছি, তাঁদের কাউকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তাঁদের কামনা থাকত, অন্য কেউ যদি সমাধান দিয়ে দিত।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩৪৯

যুবায়েদ ইবনুল হারিস রহ. বলেন-

مَا سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِهِ.

‘আমি যতবারই ইবরাহীম নাখায়ী রহ.কে মাসআলা জিজ্ঞেস করি প্রতি-বারই তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখি।’ সুনানে দারেমী ১/২৪৭ (১৩৩)

একদিন এক লোক ইমাম মালেক রহ.কে বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, আমাকে মাসআলা বলে দিন। তখন ইমাম মালেক রহ. বলেন-

وَيْحَكَ أَتُرِيْدُ أَنْ تَجْعَلَنِيْ حُجَّةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ؟ فَأَحْتَاجُ أَنَا أَوَّلًا أَنْ أَنْظُرَ كَيْفَ خَلَاصِيْ ثُمَّ أُخَلِّصُكَ.

‘দুর্ভাগা! তুমি কি আমাকে তোমার মাঝে আর আল্লাহর মাঝে দলিল বানাতে চাও। আগে আমি কীভাবে বাঁচতে পারি তা দেখব, তারপর তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব।’ তারতীবুল মাদারিক

ইমাম শাফেয়ী রহ.কে একদিন একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন। কেউ এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-

حَتّٰى أَدْرِيَ أَنَّ الْفَضْلَ فِي السُّكُوْتِ أَوْ فِي الْجَوَابِ.

‘আমি চিন্তা করে দেখি মঙ্গল কীসে, চুপ থাকায় না জবাব দেওয়ায়?’ আলমাজমূ ১/৬৯

এ ধরনের আরো বহু বক্তব্য সালাফের মুফতীগণ থেকে বর্ণিত আছে। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হল। এসব উক্তি থেকে সুস্পষ্ট যে, মুফতীগণ ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কত শঙ্কিত থাকতেন।

তাঁদের প্রত্যেকের পূর্ণ চেষ্টা থাকত, কীভাবে তাঁরা এ কাজ থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

ফতোয়ার ক্ষেত্রে যখন তাঁদের এত ভয় ও শঙ্কা সেখানে তাঁরা কাউকে তাঁদের কাছে ফতোয়া চাইতে বলবেন বা তাঁদের ফতোয়ার দিকে ডাকবেন, তা তো কল্পনাও করা যায় না।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেন-

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَلُوْنِي إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

'সাহাবীদের কেউই বলতেন না আমাকে মাসআলা জিজ্ঞেস কর। তবে আলী ইবনে আবী তালেব রা. তা বলতেন।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩৫২
খতীব বাগদাদী রহ. এর কারণ বলেন, তিনি তখনই এমন বলতেন, যখন ফতোয়া দেওয়ার মতো কেউ ছিল না।

বরং কোনো মুফতী যদি তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করার কামনা করে তাহলে সে সালাফের কাছে মুফতী হওয়ারই যোগ্য নয়।

বিশিষ্ট তাবেয়ী বিশ্র ইবনুল হারিছ রহ. বলেন-

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسْأَلَ.

'যে কামনা করে তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হোক, সে জিজ্ঞাসার উপযুক্ত নয়।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩৫২

তাই সালাফ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো প্রাজ্ঞ মুফতী মানুষকে তার কাছে ফতোয়া জানতে আহ্বান করেননি বা তার কাছে ফতোয়া জানতে নির্দেশ দেননি। চার ইমামও যেহেতু সেসব মুফতীর অন্তর্ভুক্ত, বরং তাদের শীর্ষে, তাই তারাও এমনটি করতে পারেন না এবং এমনটি করেনওনি।

তবে কোনো মুফতী কর্তৃক তার ফতোয়া মানার প্রতি আহ্বান না করার অর্থ এই নয় যে, এ কারণে তার ফতোয়া মানা যাবে না বা আহ্বান না করা সত্ত্বেও মানলে তাতে কোনো অসুবিধা আছে। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই পর্যন্ত এমন কোনো মুফতী খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার ফতোয়া মানা যাবে। কারণ, প্রত্যেক মুফতীই এমন ছিলেন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুফতীকে সমকালীন ও পরের লোক মেনে আসছে। যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কেউই তাদের ফতোয়া মানতে বলে যাননি। অথচ যুগ যুগ ধরে হাজারো তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, উলামা ও মুহাদ্দিস সবাই তা মেনে আসছেন।

আচ্ছা, যদি এমন আহ্বান না করলে কারো ফতোয়া মানতে অসুবিধা হয়, তাহলে সাহাবী যুগ থেকে এই পর্যন্ত এত শত মুফতীকে ফতোয়ার মসনদে বসানো হল কেন? তাদের কেউই তো এমন আহ্বান করেননি। তাহলে প্রয়োজন ছিল এমন মুফতীর, যারা এমন আহ্বান করবে। বলা বাহুল্য, এমন আহ্বান করলে সে মুফতী হওয়ারই যোগ্য থাকে না।

আলকামা ইবনে কায়েস ইবনে আব্দুল্লাহ আননাখায়ী রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী রহ., মাসরুক ইবনুল আজদা' রহ., ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কায়েস আননাখায়ী রহ., আমের ইবনে শারাহীল আশশা'বী রহ., কাবীসা ইবনে যুআইব রহ., সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরী রহ., ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলআনসারী রহ., সাঈদ

ইবনে যুবায়ের রহ., তাউস ইবনে কাইসান রহ., মুজাহিদ ইবনে জাব্র রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., ইকরিমা রহ.—এই স্তরের অসংখ্য মুফতী কীভাবে ফতোয়া দিলেন এবং মানুষ তাদেরকে কীভাবে মানলেন? তাদের কেউই মানুষকে তাদের প্রতি ডাকার দুঃসাহস করতে পারেননি। আর তাদেরকে তাদের উস্তাদগণ কেন ফতোয়ার মসনদে বসালেন।

বরং স্পষ্ট কথা হল, কোনো মুফতীকে এজন্যই ফতোয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়, মানুষ তার থেকে ফতোয়া জানবে এবং সে ফতোয়া মানবে। কোনো মানুষ কোনো মুফতীর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করার মানেই হল মুফতী সাহেব যা ফতোয়া দেবেন সে অনুযায়ী আমল করবে। অন্যথায় ইসলামের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত হাজারো মুফতী নিয়োগের এবং মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, শাম, ইয়ামান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্যেক যুগে লাখো মানুষের মুফতীকে মাসআলা জিজ্ঞেস করার কোনো মানেই হয় না।

ইমাম মালেক রহ. বলেন-

مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُونَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ

'আমাকে মদীনার তৎকালীন সত্তরজন উস্তাদ ফতোয়ার যোগ্য বলার পর আমি ফতোয়া দিতে শুরু করি।' আলফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫

মক্কার তৎকালীন মুফতী মুসলিম ইবনে খালিদ আযযানজী রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে বলেন-

أَفْتِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَدْ-وَاللهِ-آنَ لَكَ أَنْ تُفْتِيَ.

‘হে আবু আব্দুল্লাহ, তুমি ফতোয়া দিতে শুরু কর। আল্লাহর শপথ! তোমার এখন ফতোয়া প্রদানের সময় হয়েছে।’ সিয়ারু আলমিন নুবালা ৮/২৪০

কুফার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুফতী ইবরাহীম নাখায়ী রহ. যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার পর আমরা কাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করব?

উত্তরে বললেন, তোমরা হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানকে জিজ্ঞেস করবে।’

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ.-এর ইন্তেকালের পর কুফাবাসী ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। আলখাইরাতুল হিসান ৬১

তাহলে তাদেরকে তাদের উস্তাদ কর্তৃক ফতোয়ার মসনদে বসিয়ে দেওয়ার মানে কী?

মূল কথা হল, যখন তাদের উস্তাদগণ তাদেরকে ফতোয়ার কাজ সোপর্দ করেন আর হাজারো মানুষ তাদেরকে ফতোয়াও জিজ্ঞেস করে—এর অর্থই হল, তাদের উস্তাদগণ মানুষকে তাদের ফতোয়া মানতে বলছেন। আর মানুষও তাদের ফতোয়া মেনে নিচ্ছে।

এসব মুফতীর ফতোয়া প্রদান করার মানেই হল, তাদের ফতোয়া মানতে কোনো অসুবিধা নেই এবং প্রশ্নকারী যেন তা অনুসরণ করে। অন্যথায় এসব ফতোয়া মানতে যদি কোনো অসুবিধা থাকবে বা প্রশ্নকারীর মনোভাব এমন হয়, ব্যস, শুধু জিজ্ঞেসই করলাম, মানলে মানলাম না মানলে নাই, তাহলে এমন একটি অহেতুক কাজে শত শত মুফতী তাদের পুরো জীবন কেন ক্ষয় করলেন।

বাকি, তারা ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে শঙ্কিতও থাকতেন। অনেকে তাদের ফতোয়া লিপিবদ্ধ হোক তাও চাইতেন না। এরপরও এসব শঙ্কা সত্ত্বেও কেউ কেউ তার ফতোয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করে। আবার অনেকের ফতোয়া তাদের অবগতিতেই তাদের শাগরেদরা লিপিবদ্ধ করে। এসবের অর্থ এটাই, কেউ এগুলো অনুসরণ করলে তাতে দোষের কিছু নেই।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. ইমাম আহমাদ রহ.-এর ক্ষেত্রে চমৎকার বলেছেন-

وَيكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ كَلَامُهُ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ جِدًّا، فَعَلِمَ اللهُ حُسْنَ نِيَّتِه وَقَصْدِه فَكُتِبَ مِنْ كَلَامِه وَفَتْوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِيْنَ سِفْرًا، وَمَنَّ اللهُ سُبْحانَهُ عَلَيْنَا بِأَكْثَرِهَا فَلَمْ يَفُتْنَا مِنْهَا إِلّا الْقَلِيْلُ، وَجَمَعَ الْخَلّالُ نُصُوصَهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ فَبَلَغَ نَحْوَ عِشْرِيْنَ سِفْرًا أَوْ أَكْثَرَ، وَرُوِيَتْ فَتَاوِيْهِ وَمَسَائِلُهُ وَحُدِّثَ بِهَا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ فَصَارَتْ إِمَامًا وَقُدْوَةً لِأَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ حَتّٰى إِنَّ الْمُخَالِفِيْنَ لِمَذْهَبِهِ بِالْاِجْتِهَادِ وَالْمُقَلِّدِيْنَ لِغَيْرِهِ لَيُعَظِّمُوْنَ نُصُوصَهُ وَفَتَاوَاهُ.

'ইমাম আহমদ রহ. তাঁর ফতোয়া লিপিবদ্ধ হোক তা চাইতেন না। এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই সুন্দর মনোভাবের প্রতিদান দিয়েছেন। তাঁর ত্রিশ খণ্ডেরও বেশি ফতোয়া লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেগুলোর অধিকাংশই দান করেছেন। সামান্য ছাড়া সবই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ইমাম খাল্লাল রহ. ইমাম আহমাদ রহ-এর ফতোয়া ও বক্তব্যগুলো আলজামিউল কাবীরে সংকলন করেছেন, যা বিশের অধিক খণ্ডে উন্নীত হয়। এসব ফতোয়া তার থেকে বর্ণিত। যুগ যুগ ধরে সেগুলো রেওয়ায়েত হতে থাকে। ফলে তার ফতোয়া সংকলন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর সকল শ্রেণির ইমাম এবং আদর্শে পরিণত

হয়। এমনকি অন্যান্য ইমাম ও তাদের অনুসারীরা পর্যন্ত তাঁর এসব ফতোয়া ও বক্তব্যকে সম্মান করেন।' ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন ১/৪৫

ইমাম শাফেয়ী রহ. নিজের অনেক ফতোয়া দলিলসহ বিস্তারিতভাবে নিজেই লিখে নেন। সেসব লিখিত সংকলন সমষ্টিকে 'কিতাবুল উম্ম' বলা হয়, যা বর্তমানে দশ খণ্ডে মুদ্রিত। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ফতোয়াও তাঁর জীবদ্দশায়ই লিখিত হয়। ইমাম মালেক রহ.-এর ফতোয়াও তেমনিভাবে লিখিত হয়। ইমাম মালেক রহ.-এর ছাত্র কা'নাবী বলেন, একদিন আমি ইমাম মালেক রহ.-এর ঘরে যাই। দেখি, তিনি কাঁদছেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-

وَمَنْ أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ مِنِّيْ؟ لَاأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ إِلَّا كُتِبَتْ بِالأَقْلَامِ وَحُمِلَتْ إِلَى الْآفَاقِ

'আমি না কাঁদলে কে কাঁদবে। আমি কোনো শব্দ উচ্চারণ করলেই তা লেখা হয়ে যায় এবং চর্তুদিকে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।' তারতীবুল মাদারিক

ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর কিতাবাদি লিখে বলেন-

وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّمُوْا هٰذَا الْعِلْمَ عَلٰى أَنْ لَا يُنْسَبَ إِلَيَّ حَرْفٌ مِنْهُ.

'আমি চাই মানুষ এই ইলম শিখবে এবং এর একটি হরফেও আমার নাম নেবে না। (অর্থাৎ তাঁর যশ-খ্যাতির কোনো প্রয়োজন নেই।)' তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ১৪/১৭৮

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একটি উক্তি আগে গেছে। তিনি বলেন, যদি ইলম বিলুপ্ত হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার পাকড়াওয়ের ভয় না থাকত, তাহলে আমি কাউকে কোনো ফতোয়াই দিতাম না।

মোটকথা, চার ইমামের ফতোয়া প্রদান এবং সেগুলোর সংকলন ও সংরক্ষণ—এগুলোই প্রমাণ যে, এসব ফতোয়া মানতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং এগুলো মানার জন্যই প্রদান করা হয়েছে এবং সংকলন করা হয়েছে।

সারকথা হল, ফতোয়া খুবই নাজুক ও শঙ্কার বিষয়। সকল মুফতীই নিজেকে এ থেকে সরিয়ে রাখতে চান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে এই কাজে নিয়োজিত হতে হয়। কোনো মুফতীর এমন দুঃসাহস নেই, সে মানুষকে নিজের ফতোয়ার অনুসরণ করার আহ্বান করবে। বরং এমন করলে সে মুফতী হওয়ারই যোগ্য থাকে না। তাই এই পর্যন্ত কোনো মুফতী মানুষকে এমন আহ্বান করেননি। চার ইমামও যেহেতু শ্রেষ্ঠ মুফতী, তাই তাঁরাও এমন করেননি। তবে একথা স্পষ্ট ভুল যে, এমন আহ্বান না করলে তাঁদের কথা মানা যাবে না, অনুসরণ করা যাবে না। আহ্বান না করা তো বরং পূর্ণ সতর্কতারই প্রমাণ। বাকি, তাদেরকে ফতোয়ার মসনদে বসানো এবং তৎকালীন হাজারো লোক তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করার মানেই হল সমকালীন আলেম ও জনসাধারণ সবারই বিশ্বাস তাঁদের ফতোয়া অনুসরণ করা যাবে। আর এসব মুফতী কর্তৃক প্রশ্নকারীকে ফতোয়া প্রদান, তাঁদের তত্ত্বাবধান ও অবগতিতে ফতোয়া লিপিবদ্ধ ও সংকলন—এসব মানেই হল তখন তো বটেই পরবর্তী সময়েও এসব ফতোয়া মানা যাবে এবং অনুসরণ করা যাবে। এটা খোদ ওই মুফতীগণেরও বক্তব্য এবং তাঁদের কর্তৃক স্বীকৃত।

উদাহরণ দিলে সম্ভবত বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর সময়কার নিজ অঞ্চলের মুফতী ছিলেন, যেমন শায়েখ বিন বায্ রহ. ছিলেন তাঁর সময়কার আপন দেশের প্রধান মুফতী। উভয়ের কেউই নিজেদের ফতোয়ার প্রতি কাউকে আহবান করেননি এবং করতেও পারেন না। তারপরও তাদের অঞ্চলের মানুষ তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছে, তাদের অনুসরণ করেছে। সে হিসেবে তারা ফতোয়া দিয়ে গেছেন, সেসব ফতোয়া তাদেরই জীবদ্দশায় সংকলিত হয়, অনুলিপি করা হয়, ছাপা হয়।

সুতরাং এটা এজন্যই যে, কেউ যেন এসব ফতোয়া মানলে মানতে পারে এবং তাতে তাদের পক্ষ থেকে কোনো অসুবিধা নেই। এতে তাদের সমর্থন আছে। তাই আরবের একাংশ এসব ফতোয়া অদ্যাবধি অনুসরণ করে আসছে। আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও শায়েখ বিন বায্ রহ.-এর ফতোয়া সংকলন অনুসরণ করা যাবে না। কারণ, তাদের কথা মানতে তারা তো কাউকে আহবান করেনি। তবে কথা হচ্ছে, আমরা শায়েখ বিন বায্ রহ.-এর বিষয়গুলো সহজে বুঝি আর সালাফের যুগের মুফতীগণের বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করি না।

আরেকটি কথা হল, একজনের ফতোয়া মানার জন্য শরীয়ত ও বিবেকের আদালতে এমন কোনো শর্ত নেই যে, সে মুফতী তার ফতোয়ার প্রতি মানুষকে আহবান করতে হবে, বরং সে যদি কোনোভাবে আহবান নাও করে আর সে মুফতী বাস্তবে বিশ্বস্ত হয়, তাহলে তার ফতোয়া মানা যাবে, এতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। এক্ষেত্রে কোনো বিবেকবানের সন্দেহ থাকার কথা নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হোন।

কোনো কোনো ভাই প্রশ্ন তোলেন, আমাদের আদর্শ নবী, ইমাম নয়। আমরা নবীকে মানতে আদিষ্ট, ইমামকে নয়।

আমাদের এই ভাইদের ধারণা, ইমাম আর নবী যেন বিপরীতমুখী দুইটি সত্তা। অথচ ইমামদের সবাই হলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা ওয়ারিস, যারা নবীজীর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তের শারেহ তথা ভাষ্যকার ও সংকলক।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. ফতোয়ার হাকীকত ও পরিচয় এবং মুফতীগণের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন যে, ফতোয়া হল আল্লাহর বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দার কাছে পৌঁছানো। সর্বপ্রথম এই দায়িত্ব পালন করেছেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর ইন্তেকালের পর এই দায়িত্ব পালন করেছেন প্রত্যেক যুগের মুফতীগণ। তাই তিনি শিরোনাম দেন এভাবে-

فَصْلٌ: اَلرَّسُوْلُ أَوَّلُ مَنْ بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ.

'প্রথম পরিচ্ছেদ : নবীজীই তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে প্রথম মুবাল্লিগ।'

এরপর লেখেন-

أَوَّلُ مَنْ قَامَ بِهٰذَا الْمَنْصِبِ الشَّرِيْفِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَأَمِيْنُهُ عَلٰى وَحْيِهِ وَسَفِيْرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَكَانَ يُفْتِيْ عَنِ اللهِ بِوَحْيِهِ الْمُبِيْنِ.

'সর্বপ্রথম এই পৌঁছানোর মহান দায়িত্ব পালন করেন সায়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, খাতামুন নাবিয়্যীন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফতোয়া প্রদান করতেন।'

এরপর শিরোনাম দেন এভাবে-

فَصْلُ مَنْ بَلَّغَ بَعْدَ الرَّسُوْلِ.

'রাসূলের পর যারা আল্লাহর বিধান পৌঁছান সে পরিচ্ছেদ।'

এই শিরোনামের অধীনে লেখেন-

ثُمَّ قَامَ بِالْفَتْوٰى بَعْدَهُ بَرْكُ الْإِسْلَامِ وَعِصَابَةُ الْإِسْلَامِ، وَعَسْكَرُ الْقُرْآنِ وَجُنْدُ الرَّحْمٰنِ، أُولٰئِكَ أَصْحَابُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْيَنُ الْأُمَّةِ قُلُوْبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَأَحْسَنُهَا بَيَانًا، وَأَصْدَقُهَا إِيْمَانًا، وَأَعَمُّهَا نَصِيْحَةً وَأَقْرَبُهَا إِلَى اللّٰهِ وَسِيْلَةً.

'আল্লাহর নবীর পর ফতোয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দেন ইসলামের বক্ষ, ঈমানের জামাত, কুরআনের লস্কর, আল্লাহর সৈন্য, তারা হলেন নবীজীর সাহাবী; যারা সমগ্র উম্মতের মাঝে সর্বাধিক নম্র দিলের, গভীর ইলম ও প্রজ্ঞা, সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা, সত্য ঈমান, সর্বমর্মী নসীহতের অধিকারী এবং লৌকিকতা মুক্ত। তাদের মাঝে কেউ কেউ অনেক ফতোয়া প্রদান করেছেন। আবার কেউ খুবই সামান্য। কেউ কেউ ছিলেন মাঝামাঝি।'

এরপর প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক অঞ্চলে চার ইমামের যুগ পর্যন্ত কারা কারা মুফতী ছিলেন এবং কারা এই তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন, তার ইতিহাস তুলে ধরেন। বইয়ের একেবারে সূচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সুতরাং ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর কথায় একেবারে পরিষ্কার, নবীজী যেমন মুবাল্লিগ, নবীজীর পর মুফতীগণ নবীজীর মাধ্যম হিসেবে এবং তাঁর ওয়ারিশ হিসেবে আল্লাহর বিধানের মুবাল্লিগ। মুফতীগণ নবীজীরই স্থলাভিষিক্ত।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন-

فَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَحْلِيلُ مَا حَلَّلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَتَحْرِيمُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِيجَابُ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ: وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ حَالٍ: سِرًّا وَعَلَانِيَةً لَكِنْ لَمَّا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ رَجَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ وَأَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ وَسَائِلُ وَطُرُقٌ وَأَدِلَّةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ الرَّسُولِ يُبَلِّغُونَهُمْ مَا قَالَهُ وَيُفَهِّمُونَهُمْ مُرَادَهُ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِمْ وَاسْتِطَاعَتِهِمْ.

‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা হালাল করেছেন তা হালাল মনে করা, যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করা মানুষ ও জিন উভয় জাতির ওপর ওয়াজিব। তাদের প্রত্যেকের ওপর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় তা ওয়াজিব। তবে কিছু বিধান এমন আছে যা অনেকে জানে না। এ ব্যাপারে তারা আলেমগণের কাছে যায়। কেননা, তাঁরা নবীজী যা বলেছেন এবং কী উদ্দেশ্যে বলেছেন সে সম্পর্কে অধিক জানেন। সুতরাং মুসলমানদের ইমামগণ যাঁদেরকে তারা অনুসরণ করে মূলত তাঁরা হলেন মানুষ ও নবীজীর মাঝে মাধ্যম ও পথনির্দেশক। তাঁরা নবীজী যা বলেছেন তা পৌঁছাবেন, নবীজীর কথার কী উদ্দেশ্য তা মানুষকে বোঝাবেন।’ মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২০/২২৩-২২৪

আল্লামা শাতেবী রহ. মুফতীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

اَلْأَوَّلُ: اَلْمُفْتِي قَائِمٌ فِي الْأُمَّةِ مَقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘প্রথমত, উম্মতের মধ্যে মুফতীর অবস্থান হল নবীজীর অবস্থান।’

এরপর এর স্বপক্ষে দলিল উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

إِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِيْ تَبْلِيْغِ الأَحْكَامِ.

‘কেননা, মুফতী বিধান পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নবীজীর স্থলাভিষিক্ত।’ আলমুওয়াফাকাত ৪/৪৬৭

এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, মুফতী নবীজীর শরীয়তেরই মুবাল্লিগ ও প্রচারক।

এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। কোনো আলেম তো দূরের কথা সাধারণ কোনো মুসলমানেরও এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ-সংক্রান্ত বহু বক্তব্য অসংখ্য কিতাবে বিদ্যমান। সব এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভবও নয় আর তার প্রয়োজনও নেই। ইসলামিক কিতাবভাণ্ডারে ফিকহ-ফতেয়ার যত কিতাব আছে, তাতে মুফতীর অবস্থান ও ভূমিকা এরূপই ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ‘যতদিন আলেম ও মুফতী থাকবে ততদিন কেয়ামত হবে না। যখন এমন মুফতীর অস্তিত্ব খতম হয়ে যাবে, মানুষজন মূর্খদের মুফতী বানাবে তখন কেয়ামত অনিবার্য।’ সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০
এ হাদীসটিই এ আলোচ্যবিষয়ে যথেষ্ট।

এই অনুভব ও অনুভূতি এবং চিন্তা-চেতনা থেকেই নবীজীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলমান নিজ অঞ্চলের মুফতীর শরণাপন্ন হয়ে আসছে। তাঁদের কথা অনুযায়ী চলে আসছে। সাহাবী যায়েদ বিন ছাবিত রা., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আলী রা., উমর রা., মুআয ইবনে জাবাল রা. প্রমুখ যত সাহাবী ফতোয়া দিতেন, তাঁদের কাছে মানুষ এজন্যই যেতেন যে, তাঁরা দ্বীন সম্পর্কে ভালো জানেন। নবীজীর হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা সম্পর্কে তাঁরা অধিক অবগত। তাঁরা আল্লাহ তাআলার বিধান মানুষকে যথাযথভাবে জানাবেন।

সাহাবীদের পর আলকামা ইবনে কায়েস আননাখায়ী রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী রহ., মাসরুক ইবনে আজদা' রহ., ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী রহ., আমের ইবনে শারাহীল আশশা'বী রহ., কাবীসা ইবনে যুআইব রহ., সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরী রহ., ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলআনসারী রহ., সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ., তাউস ইবনে কাইসান রহ., মুজাহিদ ইবনে জাব্র রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., ইকরিমা রহ. প্রমুখ তাবেয়ী ইমাম ও মুফতীর কাছে মানুষ উক্ত মনোভাবেই গিয়েছে এবং তাঁদের কথা মেনেছে। তাঁদের পরে আসেন আবু হানীফা রহ., মালিক রহ., শাফেয়ী রহ., আহমদ রহ., সুফিয়ান ছাওরী রহ. প্রমুখ। তাঁদের কাছেও মানুষ এ মনোভাবেই গিয়েছে এবং তাঁদের কথা মেনেছে। আজ পর্যন্ত কোনো বিবেকবান মানুষ মুফতীকে নবীর সমতুল্য বা নবীর আদর্শ থেকে বিমুখ মনে করেছে—ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই।

মানুষের রোগ সারে ওষুধের মাধ্যমে। তাই তার দরকার ওষুধের। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে কেন যায়? এজন্যই যায় যে, এ রোগের ওষুধ কোনটি তা সে নির্ণয় করে দেবে। তেমনি মুসলমানদের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর নবীর আনুগত্য করা। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে কীভাবে আনুগত্য হবে তা নির্ণয় করে দেন ফকীহগণ। সেজন্য কুরআন হাদীস ও সালাফের উক্তিতে ফকীহের ফযীলত, কর্তব্য, ফকীহকে মানার জোর তাকিদ করা হয়েছে।

এ তো গেল বিষয়টির হাকীকত সম্পর্কে আলোচনা, বাকি থাকল 'ইমাম' শব্দ। অনেকে এ শব্দটির কারণে সংশয়ে পড়ে যায়। মুফতীর অর্থ স্পষ্ট, এটি তারা বোঝে এবং মুফতী যে নবীরই স্থলাভিষিক্ত তাও জানে; কিন্তু 'ইমাম'?

কোনো বিষয়ে কেউ অগ্রণী ও মাননীয় হলে তাকে আরবী ভাষায় 'ইমাম' বলা হয়। যেমন, হাদীস শাস্ত্রে যারা মাননীয় তাদেরকে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম বলা হয়, যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. প্রমুখ। তাফসীরের ক্ষেত্রে যারা মাননীয় তাদেরকে তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম বলা হয়। যেমন ইমাম কাতাদাহ, ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম কুরতুবী রহ. প্রমুখ। নাহু শাস্ত্রের ক্ষেত্রে যারা মাননীয় তাদেরকে সে শাস্ত্রের ইমাম বলা হয়। যেমন ইমাম সিবওয়াইহ, ইমাম র্ফারা প্রমুখ।

এভাবে প্রতিটি শাস্ত্রেই, দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যারা মাননীয় তাদেরকে ইমাম বলা হয়। ইসলামী খেলাফতের প্রধানকে ইমাম বলা হয়। খোদ নবীজীকেও ইমাম বলা হয়েছে। যেহেতু তিনি সর্বক্ষেত্রে মাননীয়। সাহাবী হাস্সান রা. তাঁর এক কবিতায় বলেন-

إِمَامٌ لَهُمْ يَهْدِيهِمُ الْحَقَّ جَاهِدًا.

'তিনি মুসলমানদের ইমাম, তিনি অনেক পরিশ্রম করে তাদের সত্যের পথ প্রদর্শন করেন।' দীওয়ানে হাস্সান ৬৯

প্রিয় নবীজী নিজের সম্পর্কে বলেন-

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ.

'কেয়ামতের দিন আমি সকল নবীর ইমাম হব। অর্থাৎ সবাই তাঁর অধীনে থাকবেন।' জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬১৩

ফিকহ ও ফতোয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। এ শাস্ত্রেও যারা আপন প্রজ্ঞা ও যোগ্যতায় অগ্রগামী এবং শীর্ষস্থান লাভ করেছেন, মানুষের কাছে যারা মাননীয় ও বরণীয় হয়েছেন, তাঁদেরকেও একই ভিত্তিতে ইমাম বলা হয়। চার ইমাম যেহেতু নিজেদের যুগের শ্রেষ্ঠ মুফতী

এবং সবার মাননীয়, তাই এই চারজনকেও ইমাম বলা হয়।

জানা কথা, এসব ইমামই ইমামুল মুরসালীন ও খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতি এবং তাঁর ইলমের ওয়ারিস।

তো ইমাম শব্দটি কোনো শাস্ত্রে বা ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ, অগ্রগামী ও মাননীয় হওয়ার কারণেই বলা হয়।

এই চার ইমাম ফিক্হ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে সবার মাননীয়। তাঁরা নবীর রেখে যাওয়া ইলমে ওহীর সংরক্ষক এবং ফতোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিধান জানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নবীর ওয়ারিস ও নায়েব। তাঁদের কেউ নবীর সুন্নাহ ও আদর্শ থেকে বিমুখ হননি যে, তাঁদের অনুসরণ করলে নবীর আনুগত্য হারাতে হবে। বরং তাঁদের অনুসরণই হল নবীর আনুগত্যের নিরাপদ ও নির্ভুল পন্থা। তাই ইমামগণের মাঝে ও নবীজীর মাঝে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আমাদের ওই ভাইয়েরা হয়ত মনে করেন, ইমাম (নাউযুবিল্লাহ!) নবীর সমতুল্য বা নবী-বিরোধী কোনো সত্তার নাম। তাই এ অজ্ঞতার দরুন তাদের মাঝে সংশয় তৈরি হয়।

এখানে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। তারা যে বলে থাকেন, কুরআন হাদীসে ইমামের কথা নেই। ইমাম মানতে হবে, এমন কিছু সেখানে নেই—এ কথা তারা বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন বলে থাকেন।

আগে বারবার বলা হয়েছে, এই চার ইমাম মানে চারজন যুগশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ও মাননীয় মুফতী। ফিক্হ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার কারণে, সর্বজন মাননীয় ও বরণীয় হওয়ার কারণে তাঁদেরকে ইমাম বলা হয়। তো কুরআন হাদীসে মুফতীর গুরুত্ব ও ফযীলত, ফতোয়ার

অপরিহার্যতা ও নাজুকতা; অসৎ ও অযোগ্য মুফতীর নিন্দা ও তিরস্কার প্রভৃতি যেহেতু আছে, তাই 'ইমাম' মানার কথাও আছে। এমনিভাবে যেহেতু কুরআন সুন্নাহয় ফকীহের প্রশংসা রয়েছে, দ্বীন জানার জন্য ফকীহের শরণাপন্ন হওয়ার তাগিদ রয়েছে এবং নবীজীর হাদীসের মর্ম অনুধাবন করার জন্য ফকীহের কাছে যেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, তাই কুরআন সুন্নাহয় ফিক্হ-ফতোয়ার এই ইমামগণকে মানার কথাও আছে।

তাই নবী ও মুফতীর মাঝে বিরোধ দাঁড় করিয়ে ইমাম ও নবীর মাঝে বৈরিতা দেখিয়ে প্রশ্ন করা শরীয়ত ও বিবেক এবং নবীর যুগ থেকে এ পর্যন্ত সকল মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন, আমীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.